Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া রহমান

রোলঃ 21500510

৩০ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া রহমান

রোলঃ 21500510

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া রহমান, আইডিঃ 21500510 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

সাদিয়া রহমান

আইডিঃ 21500510

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
১. ভুমিকা	৬
১.১. সালাত বা নামাজের পরিচয়	৯
১.২. সালাতের সংজ্ঞা	৯
১.৩. সালাতের আঞ্চলিক নাম	৯
১.৪. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় নামাজ	১০
২. নামাজের প্রকারভেদ	১০
২.১.ফরজ	১০
২.২.ওয়াজিব	১০
২.৩.সুন্নত	১১
২.৪.নফল	১১
৩.দৈনিক ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজের সময়কাল	১২
৩.১.ফজর	১২
৩.২.যোহর	১৩
৩.৩.আসর	১৩
৩.৪.মাগরিব	১৩
৩.৫.ইশা	১৩
৪.নামায পড়ার শরীয়াহ সম্মত দিনক্ষণ	১৩
৫.আল কুরআনে নামাজের গুরুত্ব	১৫
৫.১.নামাযের আদেশ	১৫
৫.২.পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ	২০
৫.৩.নামাজ মুমিনের বৈশিষ্ট্য	২৪
৫.৪.নামাজ মুত্তাকীদের গুন	২৭
৫.৫.নামাজ মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য	২৮
৫.৬.নামাজ মুখবিতানের গুণ	২৯
৬. হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব	৩২
৬.১ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইতিহাস	৩২
৬.২.৫ ওয়াক্ত নামাযের রাকায়াতের ইতিহাস	৩৩
৬.৩.৫ ওয়াক্ত নামাযের ফরজিয়াত বিধানের ইতিকথা	৩৩

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
৭. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত	৪৭
৭.১. "ফজর নামাযের" নির্দেশ ও ফজর নামাযের ফযীলত	৫০
৭.২. "যোহর নামাযের" নির্দেশ ও যোহর নামাযের ফযীলত	৫৪
৭.৩. "আসর নামাযের" নির্দেশ ও আসর নামাযের ফযীলত	৫৫
৭.৪. "মাগরিবের নামাযের" নির্দেশ ও মাগরিবের নামাযের ফযীলত	৫৭
৭.৫. "এশার নামাযের" নির্দেশ ও এশার নামাযের ফযীলত	৫৮
৮. জুমার নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত	৬০
৮.১. জুমার নামাজের গুরুত্ব	৬০
৮.২. জুম্মার নামাজ না পড়লে যে শাস্তি	৬৪
৯. কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত	৬৫
৯.১. তাহাজ্জুত	৬৫
৯.২. ইশরাক	৬৯
৯.৩. সালাতুদ্দুহা বা চাশতের সালাত	৭০
৯.৪. জাওয়াল	৭২
৯.৫.আউয়াবিন	৭৩
৯.৬.তাহিয়্যাতুল অজু	৭৫
১০.জামাতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত	৭৫
১০.১.জামাতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব	৭৬
১০.২.জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ফজিলত	৭৭
১০.৩. জামাতে সালাত আদায় না করার পরিনাম	৮০
১১. সালাতে একাগ্রতার গুরুত্ব	৮১
১২. সময়মতো নামাজ পড়ার গুরুত্ব	৯০
১৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারীতা	৯১
১৪. নামাজ না পড়ার কঠিন শাস্তি	৯৮
১৫. শেষকথা	১০০
*তথ্য সুত্র	১০২

১. ভুমিকা

নামায ইসলামী শরীয়তে ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। প্রতিদিনের নিয়মিত যে ফরজ-ওয়াজিব এবং সুন্নতে মুআক্কাদা নামায রয়েছে, তা আমাদের জন্যে অবধারিত। কুরআন ও হাদীসে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব আর কোনো ইবাদতকে দেওয়া হয় নি। কুরআনে প্রায় ৮২ স্থানে আল্লাহ সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অসংখ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব বোঝান হয়েছে। ফরযের পাশাপাশি নফল নামাযের কথাও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বারবার আলোচিত হয়েছে।

সালাত এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই।বসে, শুয়ে, দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে, যানবাহনে আরোহণ রত অবস্থায়, পোশাক পরিধান করে যে ভাবে সম্ভব মুমিন তাঁর প্রভুর দরবারে হাযিরা দেবেন। একজন মুমিনের যতক্ষণ হুশ রয়েছে, ততক্ষণ তার দায়িত্ব হলো সময় মত সালাত আদায় করা। আল্লাহ বলেন:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা আশংকিত থাক তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহর যিকির কর (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"(সুরা আল বাকারা; আয়াত: ২৩৮-২৩৯)

আসলে সালাত দায়িত্ব নয়, সুযোগ। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, দিনের মধ্যে পাঁচবার তাঁর সাথে কথা বলে, মনের সকল আবেগ তাঁকে জানিয়ে, তাঁর রহমত, বরকত লাভ করে আমরা ধন্য হব। সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি।

আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন। (সুরা আল মু'মিনূন; আয়াত:১-২)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

“সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।”

(সুরা আ'লা; আয়াত: ১৪-১৫)

সালাত হলো মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। সালাতই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

إِلَّا الْمُصَلِّينَ

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

“নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।”

(সূরা আল-মাআরিজ; আয়াত: ১৯-২৩)

কালেমায়ে শাহাদাতের পর ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন সালাত। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সালাত ফরয হওয়া কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের ইজমা (বা ঐকমত) দ্বারা প্রমাণিত।

সালাতের প্রাণ হচ্ছে খুশুখুজু যা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের (connection) অনুভব সৃষ্টি করে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভব মানবজনমকে চূড়ান্ত সফলতার দিকে নিয়ে যায়। সালাত শব্দের ধাতুমূলের একটি অর্থ 'সংযোগ' বা connection। বিশেষ করে কম্পিউটার, টেলিকম, সাইকোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ha এর একই ধাতু থেকে উদগত Jail (communication, connection, union, linkage), alias শব্দগুলো “সংযোগ' অর্থে বহুল ব্যবহৃত। এজন্যই ইসলামের প্রধান হুকুম সালাত। কেননা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কানেকশান'-ই মানবজনমের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য। আর সালাত হলো এই সংযোগের প্রধান চর্চা। দিনে পাঁচবার সালাত আদায়ের মাধ্যমে সারাদিন আমরা আল্লাহর সাথে সংযোগ অনুশীলন করি। সালাত ছাড়া ইসলামের বাকি সব হুকুম বেকার হয়ে যায়, ইসলামের পুরো কাঠামোটা আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন একটা মতবাদে পরিণত হয়ে যায়।

একজন মুসলিমের জীবনযাপনের চালিকাশক্তি তার সালাত। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যদি হয় মানবজনমের সার্থকতা, তবে সালাতই আমাদের প্রধান কাজ। যার সালাত সুন্দর, তার জীবন সুন্দর, সে সার্থক। এলোমেলো অগোছালো উদ্দেশ্যহীন জীবনে হতাশা-শূন্যতা পেয়ে বসে। সালাত ঠিক করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সংযোগ মেরামত করতে পারলে, জীবন ঠিক হয়ে যাবে। সালাতের ভেতর আল্লাহর সাথে সংযোগ হলে তা সালাতের বাইরেও আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে আল্লাহর সাথে সংযোগের অনুভূতিতে।

সকল ইবাদতের সেরা ইবাদত নামায।

১.১. সালাত বা নামাজের পরিচয়:

'সালাত' আরবি শব্দ, বহুবচনে اَلصَّلَوَات (সালাওয়াত) । সালাতের আভিধানিক অর্থ হলো,

الصلاة أي الدعاء والرحمة والإستغفار

দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত, ইত্যাদি।

وصلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَن لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ"

(সূরা আত-তাওবাহ্ (التوبة), আয়াত: ১০৩)

১.২. সালাতের সংজ্ঞা

সালাতের পারিভাষিক অর্থ-

কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত; যা [রুকু-সিজদা সহকারে] নির্ধারিত শর্তাবলি সহিত আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করত; সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। তাকে সালাত বলা হয়।

১.৩. সালাতের আঞ্চলিক নাম:

নামায শব্দটি ফার্সি: نماز শব্দ থেকে উদ্ভূত। আরবী صلاة (সালাত) শব্দের সমার্থকরূপে نماز (নামায/নামাজ) শব্দটি একাধারে উপমহাদেশীয় অঞ্চলের বাংলাদেশে বাংলা ভাষায়, ভারতে হিন্দি এবং পাকিস্তানে উর্দু ভাষায় একীভূত এবং বহুল প্রচলিত।

১.৪. ইসলামী শারীয়াতের পরিভাষায় সালাত বা নামায

ইসলামী পরিভাষায় শারিয়াহ নির্ধারিত তথা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আমলকৃত কতিপয় আহকাম-আরকান সহকারে বিশেষ বিশেষ ওয়াক্ত বা সময়কালে আদায়কৃত বিশেষ ইবাদাত-কে সালাত বা নামায বলে।

২. নামাযের প্রকারভেদ

নামাজে মহান মাবুদকে স্মরণ করা হয়, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতঅর্থে নামাজের কোনো প্রকারভেদ নেই; নামাজ নামাজই। তবে গুরুত্ব বিবেচনায় শরিয়ত নামাজকে একাধিক ভাগে ভাগ করেছে। যেমন- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাজ। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

২.১. ফরজ

ফরজ নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে। না পড়লে গুনাহ হবে। এ নামাজ আবার দুধরনের। যথা- ১. ফরজে আইন। যা প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে ফরজ। ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত নামাজগুলো হলো- ফজরের নামাজ; জোহরের নামাজ; আসরের নামাজ; মাগরিবের নামাজ; এশার নামাজ ও জুমার নামাজ। ২. ফরজে কিফায়া। যা আদায় করা প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে ফরজ নয়। যেমন- জানাজার নামাজ।

২.২. ওয়াজিব

যে নামাজের গুরুত্ব ফরজের পরই। যেমন- দুই ঈদের নামাজ ও বিতর নামাজ হচ্ছে ওয়াজিব। কেউ ইচ্ছাকৃত ও নিয়মিত না পড়লে গুনাহ হবে।

২.৩. সুন্নাত

ফরজ নামাজের পাশাপাশি সুন্নাত নামাজের গুরুত্বও কম নয়। কারণ সঠিক পদ্ধতিতে গুরুত্ব সহকারে সুন্নাত নামাজ আদায় করার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ অনুসরণ ও তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুন্নাত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়, কিয়ামতের দিন কারো ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকলে, এ নামাজ দ্বারা আল্লাহতায়ালা সেই ঘাটতি পূরণ করবেন। এ নামাজ আবার দুধরনের। যথা- ১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যা রাসুল (স.) নিয়মিত আদায় করতেন। যেমন- ফজরের ফরজের পূর্বে ২ রাকাত; জোহরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত ও পরে ২ রাকাত; মাগরিবের ফরজের পরে ২ রাকাত; এশার ফরজের পরে ২ রাকাত এবং তারাবির নামাজ। ২. সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা। যা রাসুল (স.) নিয়মিত আদায় করতেন না, কখনো বিশেষ প্রয়োজনে ছেড়েও দিতেন। এ নামাজ আদায় করলে অশেষ পুণ্য লাভ করা যায়, কিন্তু কোনো কারণে আদায় করতে না পারলে গুনাহ হবে না। যেমন- আসরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত এবং এশারের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত।

২.৪. নফল

নফল নামাজ পড়লে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। নফল সালাত; ফরজের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে।

নবী সা. বলেন,

،إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته .فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل :انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيُكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك

"কিয়ামতের দিন প্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা হলো সালাত। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলবেন-যদিও তিনি এ বিষয়ে সমধিক জ্ঞানী- তোমরা আমার বান্দার সালাত দেখ, সে কি পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছে, না অপূর্ণাঙ্গরূপে? যদি তা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয়ে থাকে তবে তা পূর্ণাঙ্গরূপেই লিখা হবে। আর যদি অপূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তাআলা বলবেন: দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল সালাত আছে কি না? নফল সালাত থেকে থাকলে আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমার বান্দার ফরয সালাত নফল সালাত দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে দাও। এরপর অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে।" আপাত দৃষ্টিতে এটা খুব একটা জরুরি মনে না হলেও প্রকৃতঅর্থে অত্যন্ত জরুরি। এ নফল নামাজই রোজ হাশরে মানুষের জন্য বেহেশত-দোযখের সিদ্ধান্তকারী হয়ে যেতে পারে। তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত, আওয়াবিন- এগুলো হলো গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ।

(সহিহ ইবনু মাজাহ, হাদিস,১৪২৫)

৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়কাল

৩.১. ফজর

'সুবহি কাজিম' শেষ হওয়ার পরক্ষণেই অর্থাৎ সুবহি সাদিক শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ফজর নামাজের ওয়াক্ত বা সময় (Timing) শুরু হয় এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ফজর নামাজের সময়। *রাতের শেষে আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বা আকৃতির যে আলোর রেখা দেখা যায় তাকে “সুবহি সাদিক” এবং এর পূর্বে পুরো দিগন্তজুড়ে আকাশ ও পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাকে “সুবহি কাজিম” বলা হয়। সুবহি কাজিম পর্যন্ত এশার নামায আদায় করা যায় পড়া যায় এবং পবিত্র রমজান মাসে সাহরী খাওয়া যায়।

৩.২. যোহর

দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ছায়া আসলি বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত যোহর নামাযের ওয়াক্ত বা সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময় যে ক্ষুদ্র ছায়া থাকে তাকেই বলে ছায়া আসলি।

৩.৩. আসর

যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগেই আসর সালাত আদায় করা উত্তম।

৩.৪. মাগরিব

সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত বা সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ ওয়াক্ত থাকে।

৩.৫. ইশা

মাগরিবের সময় শেষ হলেই ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহি সাদিকের পূর্বক্ষণ অর্থাৎ সুবেহ কাজিম পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে মধ্য রাতের আগেই এই নামাজ আদায় করা উত্তম।

৪. নামায পড়ার শরীয়াহ সম্মাত দিনক্ষণ

ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। একজন মানুষ মুসলিম পরিচয় লাভের জন্য সর্ব প্রথম তাকে ইমান আনতে হবে। আর সেই ইমানটা হলো আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তার কোনো শরিক নেই, মুহাম্মাদ সা: তার নবী ও রাসূল। এর পরই নামাজের স্থান।

রাসূলুল্লাহ সা: যখন মিরাজে গমন করেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন রাসূল সা: ও তার উম্মতের ওপর। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা সর্বমোট ৮২ বার নামাজের কথা বলেছেন।

সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন কোন বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মানুষ যে ওয়াক্তে ঈমান এনে পবিত্র দীন ইসলাম গ্রহণ করলে কিংবা এমন বালেগ মুসলমান- যাঁরা সহীহ হাদীস বর্ণিত ৭ কিংবা ১০ বছর বয়সকালে নামাযে অভ্যস্ত হননি, বালেগ হওয়ার পর যদি নামায আদায় করতে হয় তাহলে বালেগ হওয়ার আগ থেকেই শরা-শরীয়াতমত অযু, গোসল, নামাযের প্রয়োজনীয় হুকুম আহকাম, নিয়ম কানুন জেনে নেয়া কর্তব্য। কারণ, যে ওয়াক্তে সাবালকত্ব লাভ করেছেন সেই ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরযে আঈন অর্থাৎ অবশ্যই পালনীয় হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি বালেগ হওয়ার পরপরই নামায ফরয হয়ে যায়। এরপরও যদি শরাহ-শরীয়াতমত অযু, গোসল, নামাযের প্রয়োজনীয় হুকুম আহকাম, নিয়ম কানুন জানা না থাকে তাহলে বালেগ হওয়ার পর পরই নিকটস্থ মসজিদের সন্মানিত ঈমাম, খতিব, কিংবা পরিচিত কোন আলেমে দীনের শরণাপন্ন হয়ে নামায সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসয়ালা মাসায়িল জেনে নেয়া জরুরী।

পূর্ববর্তী নামায যা বালেগ হওয়ার পরপর ফরয হয়েছে সে ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে মুফতিয়ে কেরামের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

স্ত্রী-সন্তান সন্ততিদের সালাত কায়েমের নির্দেশ দিতে হবে -

٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّـهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ◯

► হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশ্তাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে। (সূরাহ তাহরীম, আয়াতঃ ৬)

► সারবা ইবনু মাবাদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে সাত বছর বয়সে সালাত (নামায) কায়েমের আদেশ দেবে। যখন তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন সালাতের জন্য মৃদু প্রহার করবে (জামে তিরমিযী; হাদিস নং:৩৮২)

৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ◯

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত"।

(সূরা আল মুনাফিকুন, আয়াত ৯)

মুফাসসিরে কিরাম বলেন, আলোচ্য আয়াতে "আল্লাহর যিকর" দ্বারা ৫ ওয়াক্ত সালাত (নামায) বুঝানো হয়েছে। সুতরাং, যে ব্যক্তি যথাসময়ে সালাত আদায় হতে গাফিল (অমনোযোগী) হয়ে বেচাকেনা উপার্জন, জীবিকা সংগ্রহ ও সন্তান-সন্ততির সাথে খেল-তামাশায় বিভোর থাকবে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

৫. আল কুরআনে নামাজের গুরুত্ব

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বিভিন্নভাবে নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বিচিত্ররূপে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন। এখানে আমরা কিছু দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

৫.১. নামাযের আদেশ

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা

হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর। (সূরা বাকারা; আয়াত: ৪৩)

অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

(সুরা আল হাজ্জ্ব; আয়াত: ৭৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড়

নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।

অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন -

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না। (সূরা আল ইবরাহীম; আয়াত: ৩১)

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।

(সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত: ৭৮)

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।

নবীজীকে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।

(সূরা হূদ; আয়াত: ১১৪)

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহ্ এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি এখানে নামাযের আদেশ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, পুণ্য পাপকে দূর করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় নামায খুব মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং এর দ্বারা গোনাহ মাফ হবে।

নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।

(সূরা আনকাবুত; আয়াত: ৪৫)

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হাঁ, নামাযের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

কুরআন হুকুম-আহকাম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুংলিঙ্গের সম্বোধন করে। দ্বিমত নেই যে, পুরুষের মত মহিলারাও এসব আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। কুরআনে এক স্থানে নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশও রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى فَيَطْمَعَ ى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব; আয়াত ৩২-৩৩)

নামাযের আদেশ সম্পর্কিত আরো, সূরা বাকারা ১১০, সূরা আনআম ৭২, সূরা নূর ৫৬, সূরা রূম ৩১, সূরা মুজাদালা ১৩ তে আয়াত আছে।

আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

৫.২. পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ

কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ. - এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।

(সূরা আম্বিয়া; আয়াত ৭৩)

মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ স¤প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও

কটাক্ষ করতে লাগল। তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন। দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ বলতে শুরু করলেন –

اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ
مَا دُمْتُ حَیًّا وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ
وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا.

আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব। (সূরা মারইয়াম; আয়াত ৩০-৩৩)

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন। আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর নূর। কাছে আসার পর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন –

اِنِّیْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی اِنَّنِیْۤ اَنَا
اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ.

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর

মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর। (সূরা ত্বহা; আয়াত: ১২-১৪)

আয়াতের শৈলী থেকে বোঝা যায়, এখানেই মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওত দান করা হয়। তো নবুওতের সূচনাতেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইবাদত। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। হাঁ, নামায আগাগোড়া আল্লাহর যিকির এবং এতে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। এটা নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। নামায ছাড়া অন্য কোনো বিধান এমন নেই, যা আদ্যোপান্ত আল্লাহর যিকির এবং যেখানে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। শুধু তাই নয়; নামাযে রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার যিকির- দাঁড়িয়ে যিকির, বসে যিকির, মাথা ঝুঁকিয়ে যিকির, মাটিতে লুটিয়ে যিকির। আল্লাহর বড়ত্বের যিকির, গৌরবের যিকির, পবিত্রতার যিকির, হামদ ও ছানার যিকির, প্রার্থনা ও নিবেদনের যিকির।

আমাদের উচিত যিকিরপূর্ণ এ ইবাদতটি মহব্বত ও মনোযোগের সাথে আদায় করা; অলসতা ও উদাসীনতার সাথে নয়। যিকিরের সঙ্গে কি উদাসীনতা মানায়?

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন-

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ি কর এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থান বানাও এবং নামায কায়েম কর আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (সূরা ইউনুস; আয়াত ৮৭)

এখান থেকে জানা গেল, মূসা আ. ও হারূন আ. - সহ তাঁদের গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল। আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিকূলতা দূর হবে।

কতিপয় তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে মূসা আ. ও হারূন আ. - কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা তখনকার কথা যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং ইবাদতখানায় নামায আদায়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তখন তাদেরকে নামায তরক না করে ঘরেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের উপর যখন নামাযের বিধান ছিল তো তাঁদের উম্মতেরা অবশ্যই এর আওতাভুক্ত ছিল। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নামাযের বিধান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

যেমন আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর এর পরও তোমাদের মধ্যে যে কুফর অবলম্বন করবে, নিশ্চয় সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে। (সূরা মায়েদা; আয়াত ১২)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাযের বিধান ছিল। সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, নামাযসহ উপরিউক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহর সঙ্গ লাভ হবে। গোনাহ মাফ করা হবে এবং জান্নাত দান করা হবে।

বনী ইসরাঈলকে নামাযের আদেশ করা সম্পর্কিত আরো আয়াতের আছে - সূরা বাকারা ৮৩; সূরা বাইয়িনা ৫

৫.৩. নামায মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর।

যেমন আল্লাহ এরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ.

তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী। (সূরা মায়েদা; আয়াত ৫৫)

এখানে মুমিনদের বন্ধু কারা এ প্রসঙ্গে কেবল তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ক. আল্লাহ। খ. রাসূল। গ. মুমিনগণ। তারপর এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ আরো বলেন-

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

ত্ব-সীন। এ কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

(সূরা নামল; আয়াত ১-৩)

এ আয়াতেও মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে নামাযের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

(সূরা আনফাল; আয়াত ২-৪)

এখানে সত্যিকার মুমিনদের গুণাবলি কী তা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা গেল সত্যিকার মুমিন হতে হলে নামায আদায় করতে হবে। নামায ছাড়া সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না।আল্লাহ আরো এরশাদ করেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের

প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। (সূরা মুমিনুন; আয়াত ১-১১)

এ আয়াতে সফল মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা তাদের নামাযে বিনীত (خٰشِعُوْنَ)।

এ শব্দটি خُشُوْع থেকে নির্গত। خُشُوْع শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনয়। কখনো ভয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এ বিষয়গুলো কাছাকাছি।

خُشُوْع কুরআনে একাধিক স্থানে অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সফল মুমিন তারা, যারা নামাযে পরিপূর্ণরূপে বিনীত, আন্তরিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও। তাদের বিনয় অন্তর-জগৎকে ছাড়িয়ে দেহ-জগৎকে প্লাবিত করে। তাদের বিনয় ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে বহিরঙ্গকে আলোকিত করে।

বিনয় মানে কী আমরা সবাই জানি- নিজেকে ছোট মনে করা। তো বিনয়ের সঙ্গে নামায পড়ার অর্থ হল নিজেকে ছোট, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী মনে করে আর আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নিজের বন্দেগী নিবেদন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য দেহমনের উপস্থিতির বিকল্প নেই।

সফল মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হল তারা তাদের নামাযমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। এই যত্নের মধ্যে সময়মত নামায পড়া, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিয়মনীতি, হক ও আদবসমূহ লক্ষ করে নামায পড়া সবই শামিল।

অপর সূরায় আল্লাহ নামাযীদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ
وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ
مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ.

যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে। এবং যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে। (সূরা মাআরিজ; আয়াত ২৩-৩৫)

এখান থেকে আমরা প্রকৃত নামাযীর পরিচয় জানতে পারলাম। প্রকৃত নামাযী হচ্ছে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি বিরাজমান থাকে, যেগুলোর শীর্ষে রয়েছে নিয়মিত নামায পড়া এবং যত্নের সাথে নামায পড়া।

সূরা মুমিনুনে উল্লেখিত সফল মুমিনের সাতটি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সম্পর্কিত। এমনিভাবে সূরা মাআরিজে উল্লেখিত নামাযীর নয়টি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সংক্রান্ত এবং উভয় সূরায় গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং শেষও হয়েছে নামায দিয়েই। এ থেকে অনুমেয়, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমানের সাথে এর কী গভীর সম্পর্ক!

৫.৪. নামায মুত্তাকীদের গুণ

যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাকে মুত্তাকী বলে। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীগণ সবচেয়ে সম্মানিত। কুরআন মুত্তাকীদের একটি গুণ এই উল্লেখ করেছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ এরশাদ করেন –

الٓمّٓ، ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ، أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই; এ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত- যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। (সূরা বাকারা; আয়াত ১-৫)

এখানে মুত্তাকীদের ৬টি গুণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম গুণ হল তারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে। দ্বিতীয় গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামায আবশ্যক।

৫.৫. নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য

যে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর ও অনুগ্রহের আমল করে তাকে মুহসিন বলা হয় (মুহসিন শব্দের বহুবচন মুহসিনূন)। আল্লাহ মুহসিনীনকে ভালবাসেন। কুরআনে তিনি তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করেছেন যে, তারা নামায আদায় করে।

আল্লাহ বলেন -

الٓمّٓ، تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ، هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ،الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ،أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত; যা হেদায়েত ও রহমত মুহসিনীনের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে পূর্ণ

বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। (সূরা লুকমান; আয়াত ১-৫)

এখানে মুহসিনীনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায আদায় করে। এটা নির্দেশ করে, নামায খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং মুহসিনীনের দলভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এর বড় ভূমিকা রয়েছে।

৫.৬. নামায মুখবিতীনের গুণ

যে আল্লাহর সামনে বিনীত, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং আল্লাহর ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত তাকে মুখবিত বলে (মুখবিত শব্দের বহুবচন মুখবিতূন) এরা আল্লাহর একান্ত আপন। কুরআনে তাদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

আর সুসংবাদ দাও মুখবিতীনকে, যাদের অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয়, যারা তাদের উপর আপতিত বিপদে সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা হজ্জ; আয়াত ৩৪-৩৫)

এ আয়াতে মুখবিতীনের ৪টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায মহিমান্বিত আমল এবং মুখবিতীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এর বিরাট অবদান রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং একে দৃঢ়ভাবে ধরার কথা বলেছেন। এক আয়াতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের কথাও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ.

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (সূরা আরাফ; আয়াত ১৭০)

কুরআনকে মজবুতভাবে ধরার সাথেই নামাযের কথা এসেছে। কেননা নামায কুরআনের অন্যতম সুস্পষ্ট বিধান। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর অধিক গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, নামায আদায় করা কুরআনকে ধারণের অংশ। নামায ছাড়া কুরআন আঁকড়ে ধরা অপূর্ণ।

নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

কুরআনে বহু জায়গায় ঈমান ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এক স্থানে নেক আমলের সঙ্গে নামাযের কথাও বলা হয়েছে।

আল্লাহ এরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না। (সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৭)

নেক আমলের ভেতর নামায রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে নামাযের কথা বলা ইঙ্গিত করে, নামায সমস্ত নেক আমলের শীর্ষে।

আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল জাযিরাতুল আরব থেকে মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ করা, যাতে সেখানে কোথাও মূর্তিপূজার চিহ্নমাত্র না থাকে। এজন্য আরবের যেসকল মূর্তিপূজক অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে এর ভেতর তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। অন্যথায় তাদের জাযিরাতুল আরব ছাড়তে হবে, নয়তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। আল্লাহ বলেন-

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অতঃপর যখন সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করবে। তাদের পাকড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ওঁৎ পাতার স্থানে তাদের জন্য বসে থাকবে। তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা; আয়াত ৫)

সামনে গিয়ে বলেছেন-

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। (সূরা তাওবা; আয়াত: ১১)

আয়াতদুটিতে মুশরিকরা নিরাপদে থাকা এবং মুসলিমদের দ্বীনী ভাই গণ্য হওয়ার জন্য শিরিক থেকে তওবা করার সঙ্গে নামায ও যাকাত আদায়ের শর্তারোপ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমেয় নামায ও যাকাত কত গুরুত্বপূর্ণ!

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন মূলত আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্য। সেইসঙ্গে দুনিয়াতে স্বাভাবিক চলার মত উপায়-উপকরণ সংগ্রহের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। তবে সতর্ক থাকতে হবে দুনিয়ার উপকরণ যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়।

কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ এমন আছেন, যারা আল্লাহর এ নির্দেশনা অনুযায়ী চলেন। কুরআনে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ،رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ.

সেই ঘরসমূহে, যেগুলোকে সমুন্নত করতে ও যেখানে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে- এমন লোকেরা,

যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল করে না। (সূরা নূর; আয়াত ৩৬-৩৭)

এখানে আল্লাহ তাঁর ওই বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর হেদায়েতের নূর অর্জন করেছে। তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। তাঁর যিকির করে। তাঁর ইবাদত করে। তাঁর হুকুম অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেচাকেনাও করে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর স্মরণ, নামায ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল হয়ে যায় না।

৬. হাদীসের আলোকে সালাতের গুরুত্ব

৬.১. দৈনিক ৫ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইতিহাস

পবিত্র লাইলাতুল মিরাজের সময় মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য হাদিয়া (উপঢৌকনস্বরূপ) ৫০ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি নামাজের ওয়াক্তের পরিমাণ আল্লাহর কাছ থেকে কমিয়ে আনার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়ে ওয়াক্তের পরিমাণ কমানোর জন্য একাধিকবার আর্জি পেশ করলে তা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। ফলশ্রুতিতে, ওয়াক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ (পাঁচ)।

(বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৯, ৩৩৪২, ৩৮৮৭; মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩ ও ২৬৪; ফাতহুল বারি: ৭/২৫০-২৫৯, মা'আরেফুল কোরআন ৭৬৪-৭৬৫)

৬.২.৫ ওয়াক্ত নামাযের রাকায়াতের ইতিহাস

শুরুতে যুহর, আসর এবং ইশার ফরজ নামায ২ রাকায়াত করে ছিল। এ প্রসঙ্গে আম্মাজান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা. বলেন মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় নামায দু’দু রাক’আত ফরজ করা হয়েছিল। পরে সফরের নামায ঠিক রাখা হল কিন্তু মুকিমের নামাযে বৃদ্ধি করা হল। (বুখারী; হাদিস নং১০৪০, মুসলিম: হাদিস নং ৬৮৫)

অপর হাদিসে এসেছে, ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফর করেছি, তিনি আজীবন সফরে ২ রাকাতের বেশি পড়েন নি। রাবী বলেন, আমি আবু বাকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও সফর করেছি, তিনিও আমরণ সফরে ২ রাকাতই পড়েছেন। আমি উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও সফর করেছি তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সফরে ২ রাকাতের বেশি পড়েন নি। রেওয়াতকারী আরো বলেন, আমি উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও সফর করেছি, তিনিও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সফরে ২ রাকাতের বেশি পড়েন নি।

৬.৩.৫ ওয়াক্ত নামাযের ফরজিয়াত বিধানের ইতিকথা

মোকাতেল ইবনে সোলায়মান (রহিমাহুল্লাহ) ৫ ওয়াক্ত নামাযের ফরজিয়াত বিধান জারির সময়কাল প্রসঙ্গে বলেন, ইসলামের শুরুর দিকে মহান আল্লাহ দুই রাকাত নামাজ সকালে ও দুই রাকাত নামাজ সন্ধ্যার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। সকাল-সন্ধ্যার ইবাদত নবুয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকেই ছিল। ইবনে হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মেরাজের ঘটনার আগেই নামাজ আদায় করতেন। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে অন্য কোনো নামাজ ফরজ ছিল কি না। কেউ কেউ বলেন, সূর্য উদয় হওয়ার আগে ও অস্ত যাওয়ার আগের এক একটি নামাজ ফরজ ছিল। বারা ইবনে আজেব (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও এ ধরণের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, “এই

নামাজ ছিল প্রথম দিকে ফরজের অন্তর্ভুক্ত"। (মুখতাসারুস সিরাহ, শেখ আবদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৮৮)

ইবনে হিশাম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন (ইসলামের সূচনাকালে) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম নামাজের সময় পাহাড়ে চলে যেতেন এবং গোপনে নামাজ আদায় করতেন। একবার চাচাজান আবু তালেব রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ও আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে নামাজ পড়তে দেখে ফেলেন। তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁকে জানানোর পর তিনি (আবু তালেব) বলেন, "এই অভ্যাস অব্যাহত রেখো"। (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭) ।

উল্লেখ্য, "রাসূলুল্লাহর হক" নামক কিতাবের ১৫০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হিজরী প্রথম সনের রবিউস সানী মাসে যোহর, আসর ও ইশার ৪ রাকআত নামাজ ফরজ করা হয়। এর আগে মাগরিবের নামাজ ফরজ করা হয় । অন্যদিকে "ফাতওয়ায়ে আবদুল হাই সিদ্দিকী" নামক কিতাবের, ৭১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর বিতির নামায ওয়াজিব করা হয়েছে।

হিজরতের পূর্বে মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। এর পূর্বে দু' ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্থাৎ- ফজরের (ফজরের) সালাত (সালাত/নামায/নামাজ)। আর সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ - আসরের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ)। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
"সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা বর্ণনা করো"

(সূরাহ্ আল মু'মিন; আয়াত; ৫৫)

'সালাত' শব্দটি কোন ধাতু (মূল শব্দ) হতে উদগত এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তা সালাত তথা রহমত শব্দ থেকে উদগত। কারো মতে তা সালাত তথা দু'আ থেকে উদগত। আবার কারো মতে তা الصلوين থেকে উদগত যার অর্থ ঐ দু'টি রগ

সালাত আদায়ের সময় যা বক্র হয়। আবার কারো মতে الصلى (অগ্নিতে প্রবেশ) শব্দ হতে উদগত।

اَلْفَصْلُ الْلأَوَّلُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ« .رَوَاهُ مُسلم

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر« .رواه مسلم

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু’আহ্ হতে অপর জুমু’আহ্ পর্যন্ত এবং এক রমাযান হতে আরেক রমাযান পর্যন্ত সব গুনাহ্ের কাফফারাহ্ হয়, যদি কাবীরাহ্ (কবিরা) গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।

(সহীহ মুসলিম ২৩৩, আহমাদ ৯১৯৭, সহীহাহ্ ৩৩২২, সহীহ আল জামি ‘৩৮৭৫, সহীহ আত তারগীব ৬৮৪)

اَلْفَصْلُ الْلأَوَّلُ

وَعَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا :لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ .قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

وعنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا :لا يبقى من درنه شيء .قال :فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীগণের উদ্দেশে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে

তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়কারীর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করেন। (সহীহ বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৬৬৭, নাসায়ী ৪৬২, তিরমিযী ২৮৬৮, আহমাদ ৮৯২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭২৬, ইরওয়া ১৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫২)

ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু দিয়েছিল। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি বললো। এ সময়ে আল্লাহ ওয়াহী নাযিল করেনঃ

وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ

সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ক্বায়িম কর দিনের দু'অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক কাজ পাপ কাজকে দূর করে দেয়' - (সূরাহ্ হূদ; আয়াত: ১১৪)

লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কি আমার জন্য? তিনি বললেন, এটি আমার সকল উম্মতের জন্য। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে তিনি বলেছিলেন, "আমার উম্মাহর মধ্যে যারা এটি মেনে চলে তাদের জন্যও।"

اَلْفَصْلُ الْلأَوَّلُ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى) :وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْل إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات)

فَقَالَ الرَّجُلُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا؟ قَالَ :»لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ « .وَفِي رِوَايَةٍ :»لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي«

وعن ابن مسعود قال :إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى) :وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات (فقال الرجل :يا رسول الله ألي هذا؟ قال :»لجميع أمتي كلهم « .وفي رواية: »لمن عمل بها من أمتي«

(সহীহ বুখারী ৫২৬, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১৪, ইবনু মাজাহ্ ৪২৫৪, আহমাদ ৩৬৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭২৯)

اَلْفَصْلُ الْلأَوَّلُ

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقمه عَلَيّ قَالَ وَلم يسْأَله عَنهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاة قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقم فِي كتاب الله قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَو قَالَ حدك

وعن أنس قال :جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি ‘হাদ্দ’যোগ্য-এর কাজ (অপরাধ) করে ফেলেছি। আমার ওপর তা প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করলেন। লোকটিও রসূলের সাথে সালাত আদায় করলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাত শেষ করলে লোকটি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি হাদ্দ-এর কাজ করেছি। আমার ওপর আল্লাহর কিতাবের নির্দিষ্ট হাদ্দ জারী করুন। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করনি। লোকটি বলল, হ্যাঁ, করেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (এ সালাতের মাধ্যমে) আল্লাহ তোমার গুনাহ বা হাদ্দ মাফ করে দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ২৭৬৪)

আবদুল্লাহ (রাঃ)] ইবনু মাস্’ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ (‘আমল) আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সঠিক সময়ে সালাত

(সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী [ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ)] বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এসব উত্তর দিলেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আরও কথা বলতেন।

اَلْفَصْلُ الْلأَوَّلُ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي الْأَعْمَال أحب إِلَى الله قَالَ :»الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا« قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ :»بِرُّ الْوَالِدَيْنِ« قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ :»الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ« قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ استزدته لزادني

وعن عبد الله بن مسعود قال :سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال :»الصلاة لوقتها« قلت ثم أي قال :»بر الوالدين« قلت ثم أي قال :»الجهاد في سبيل الله« قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني

সহীহ বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৮৫, নাসায়ী ৬১০, আহমাদ ৩৮৯০, ইরওয়া ১১৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৯৭

اَلْفَصْلُ الْلأَوَّلُ

«وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ ترك الصَّلَاة رَوَاهُ مُسلم.

. «وعن جابر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মু'মিন) বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) পরিত্যাগ করা।

(সহীহ মুসলিম ৮২, আবূ দাঊদ ৪৬৭৮, নাসায়ী ৪৬৪, তিরমিযী ২৬২০, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لوقتهن وَأتم ركوعهن خشوعهن كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ« .رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالك وَالنَّسَائِيّ نَحوه

عن عبادة بن الصامت قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن خشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه« .رواه أحمد وأبو داود وروى مالك والنسائي نحوه

‘উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ), যা আল্লাহ তা’আলা (বান্দার জন্য) ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এ সালাতের জন্য ভালোভাবে উযূ (ওযু/ওজু/অজু) করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকূ’ ও খুশুকে পরিপূর্ণরূপে করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া’দা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া’দা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

মালিক এবং নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (সহীহ আহমাদ ২২৭০৪, আবূ দাঊদ ৪২৫, মালিক ১৪, নাসায়ী ৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৭০)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تدْخلُوا جنَّة ربكُم« .رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ

وعن أبي أمامة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم« .رواه أحمد والترمذي

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের ওপর ফরয করা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় কর, তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা মাসটির সিয়াম (রোযা) পালন কর, আদায় কর তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (সহীহ আহমাদ ২১৬৫৭, তিরমিযী ৬১৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৬৭)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِين» وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ« .رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِي شرح السّنة عَنهُ

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع« .رواه أبو داود وكذا رواه في شرح السنة عنه

আমর ইবনু শু’আয়ব (রহঃ) তার পিতার মাধ্যমে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমার সন্তানদের বয়স সাত বছরে পৌঁছবে তখন তাদেরকে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়ের জন্য নির্দেশ দিবে। আর (সালাত আদায় করার জন্য) তাদের শাস্তি দিবে যখন তারা দশ বছরে পৌঁছবে এবং তাদের ঘুমানোর স্থান পৃথক করে দিবে।

শারহুস্ সুন্নাহ-তে এভাবে রয়েছে। (হাসান আবূ দাঊদ ৪৯৫, সহীহুল জামি’ ৫৮৬৮, আহমাদ ২/১৮০ ও ১৮৭)

মাসাবীহ-তে সাবরাহ্ ইবনু মা’বাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

وَفِي المصابيح عَن سُبْرَة بن معبد

وفي المصابيح عن سبرة بن معبد

বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিক্বদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হলো সালাত। অতএব যে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) পরিত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কুফরী করলো (অর্থাৎ- কাফির হয়ে যাবে)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ« .رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

وعن بريدة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر« .رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه

(সহীহ তিরমিযী ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৯ সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৪, আহমাদ ২২৯৩৭)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ :»يَا أَبَا ذَرٍّ« قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :»إِنَّ العَبْد الْمُسلم ليصل الصَّلَاة يُرِيد بهَا وَجه الله فتهافت عَنهُ ذنُوبه كَمَا يتهافت هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ« .رَوَاهُ أَحْمَدُ

وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم :خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال :»يا أبا ذر« قلت لبيك يا رسول الله قال :»إن العبد المسلم ليصل الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة« .رواه أحمد

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গাছের দু'টি ডাল ধরে নাড়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন,

তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগলো। আবূ যার (রাঃ) বলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।

(হাসান আহমাদ ২১০৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩৮৪)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ« .رَوَاهُ أَحْمَدُ

وعن زيد بن خالد الجهني قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه« .رواه أحمد

যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু’ রাক্’আত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করেছে, আর এতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ (সগীরাহ্) ক্ষমা করে দিবেন।

(হাসান সহীহ আহমাদ ২১১৮৩, আবূ দাঊদ ৯০৫, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮)

اَلْفَصْلُ الثَّالثُ

وَعَن عبد الله بن شَقِيق قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكه كفر غير الصَّلَاة .رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

وعن عبد الله بن شقيق قال :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .رواه الترمذي

‘আবদুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ছাড়া অন্য কোন ‘আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না।

(সহীহ তিরমিযী ২৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৫)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ :أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمدا فَمن تَركهَا مُتَعَمدا فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كل شَرّ .رَوَاهُ ابْن مَاجَه

وعن أبي الدرداء قال :أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر .رواه ابن ماجه

আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেনঃ (১) তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ডবিখন্ড করা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়; (২) ইচ্ছা করে কোন ফরয সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ত্যাগ করবে না, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ত্যাগ করবে তার ওপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে; (৩) মদ পান করবে না, কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি।

(হাসান লিগয়রিহী ইবনু মাজাহ্ ৪০৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৭)

بَابُ الْـمَوَاقِيْتِ

عَن عبد اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاة فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان« .رَوَاهُ مُسلم

عن عبد الله ابن عمرو قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان« .رواه مسلم

সময়কে আল্লাহ তা’আলা সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘‘নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মু’মিনদের ওপর ফরয।’’ (সূরাহ্ আন্ নিসা; আয়াত: ১০৩)

সালাতের সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর জিবরীল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সরাসরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সালাতের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

‘আবদুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূর্য ঢলে পড়ার সাথে যুহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মানুষের ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তখন ‘আসরের সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়। ‘আসরের সালাতের ওয়াক্ত যুহরের সালাতের পর থেকে যে পর্যন্ত সূর্য হলদে রং ধারণ না করে এবং সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লালিমা মিশে যাবার আগ পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত থাকে। আর ‘ইশার সালাতের ওয়াক্ত মাগরিবের সালাতের পর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত। ফজরের (ফজরের) সালাতের ওয়াক্ত ফাজর (ফজর) অর্থাৎ- সুবহে সাদিকের উদিত হবার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। অতঃপর সূর্যোদয় হতে শুরু করলে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) হতে বিরত থাকবে। কেননা সূর্যোদয় হয় শায়ত্বনের (শয়তানের) দু’ শিং-এর মধ্য দিয়ে।

(সহীহ মুসলিম ৬১২, আহমাদ ৬৯৬৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪৭৩)

بَابُ الْـمَوَاقِيْتِ

وَعَن بُرَيْدَة قَالَ :أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ :»صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ« يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ

. «عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :»وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَين مَا رَأَيْتُمْ
رَوَاهُ مُسلم

:وعن بريدة قال :أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له
صل معنا هذين« يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر»
ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت
الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما
أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر
والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء
بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال
الرجل أنا يا رسول الله قال :»وقت صلاتكم بين ما رأيتم« .رواه مسلم

বুরায়দাহ্ (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, আমাদের সাথে এ দু' দিন সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় কর। প্রথমদিন সূর্য ঢলে পড়লে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন আযান দিতে। বিলাল (রাঃ)আযান দিলেন। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলে বিলাল (রাঃ)যুহরের সালাতের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন। অতঃপর ('আসরের সময়) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি 'আসরের সালাতের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন। তখনও সূর্য বেশ উঁচুতে ও পরিষ্কার সাদা। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি মাগরিবের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন। তখন সূর্য দেখা যাচ্ছে না। এরপর বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি 'ইশার সালাতের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন, যখন মাত্র লালিমা অদৃশ্য হলো। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি ফজরের (ফজরের) সালাতের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন। তখন ঊষা (সুবহে সাদিক) দেখা দিয়েছে।

যখন দ্বিতীয় দিন এলো তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, যুহরের সালাত ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত দেরী করতে। বিলাল দেরী করলেন। রোদের তাপ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর 'আসরের সালাত আদায় করলেন। সূর্য তখন উঁচুতে অবস্থিত, কিন্তু সালাতে পূর্বের দিনের চেয়ে বেশী দেরী করলেন। মাগরিবের সালাত আদায় করলেন লালিমা অদৃশ্য হবার কিছুক্ষণ আগে। আর এ দিন 'ইশার সালাত আদায় করলেন রাতের এক তৃতীয়াংশ শেষ হবার পর। অতঃপর ফজরের (ফজরের) সালাত আদায় করলেন বেশ পরিষ্কার হওয়ার পর। সবশেষে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এই যে আমি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের জন্য সালাত আদায় করার ওয়াক্ত হলো, তোমরা যা (দু' সীমা) দেখলে তার মধ্যস্থলে।

(সহীহ মুসলিম ৬১৩, ইবনু মাজাহ্ ৬৬৭, তিরমিযী ১৫২, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্ ৩২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪৯২, আহমাদ ২২৯৫৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِين كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله وَصلى بِي يَعْنِي الْمغرب حِين أفطر الصَّائِم وَصلى بِي الْعشَاء حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين . «رواه أبو داود والترمذي

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জিবরীল আমীন খানায়ে ক্বা’বার কাছে দু’বার আমার সালাতে ইমামাত করেছেন। (প্রথমবার) তিনি আমাকে যুহরের সালাত আদায় করালেন, সূর্য তখন ঢলে পড়েছিল। আর ছায়া ছিল জুতার দোয়ালির (প্রস্থের) পরিমাণ। ‘আসরের সালাত আদায় করালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার এক গুণ হলো। মাগরিবের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারী (রোযাদার) ইফত্বার করে। ‘ইশার সালাত আদায় করালেন যখন ‘শাফাক্ব অস্তমিত হলো। ফজরের (ফজরের) সালাত আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারীর জন্য পানাহার হারাম হয়।

দ্বিতীয় দিন যখন এলো তিনি আমাকে যুহরের সালাত আদায় করালেন, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার এক গুণ। ‘আসরের সালাত আদায় করালেন, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ। মাগরিবের সালাত আদায় করালেন, সায়িমগণ (রোযাদাররা) যখন ইফত্বার করে। ‘ইশার সালাত আদায় করালেন, তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি ফাজর (ফজর) আদায় করালেন তখন বেশ ফর্সা। এরপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই আপনার পূর্বেকার নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত। এ দুই সময়ের মধ্যে সালাতের ওয়াক্ত।

(সহীহ আবূ দাঊদ ৩৯৩, তিরমিযী ১৪৯, সহীহুল জামি’ ১৪০২)

৭. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

পবিত্র কুরআনুল কারিমের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা সময়গুলো সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন -

فَسَبّْحَنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُوْنَ)١٧(

وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِيْنَ تُظْهِرُونَ)١٨(

সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাসবিহ আদায় কর, যখন সন্ধ্যায় (মাগরিব ও ইশার নামায দ্বারা) উপনীত হবে এবং সকালে (ফজর নামায দ্বারা) উঠবে। আর অপরাহ্নে (আসর নামায দ্বারা) ও জোহরের সময়ে। আর আসমান ও জমিনে সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই*।' (সুরা রূম; আয়াত: ১৭,১৮)

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজ পবিত্র সত্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা। যার উদ্দেশ্য হল নিজ বান্দাকে পথ প্রদর্শন যে, উক্ত সময়গুলিতে, যা একের পর এক আসতে থাকে এবং যা আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও মহত্ত্ব বুঝায়, তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করানো। সন্ধ্যা ও সকাল হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলোর প্রারম্ভ। এশা খুব অন্ধকার এবং যোহর খুব উজ্জ্বলতার সময় হয়ে থাকে। অতএব ঐ সত্তা অতি পবিত্র যিনি উক্ত সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি সেই বিভিন্ন সময়ের মধ্যে আলাদা আলাদা উপকারিতা রেখেছেন। অনেকে বলেন, এখানে 'তাসবীহ'র অর্থ হল নামায। উক্ত দুটি আয়াতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা হল, পাঁচ অক্ত নামাযের সময়। تُمسون)সন্ধ্যা) শব্দে মাগরিব-এশা, تُصبِحُون)ভার(শব্দে ফজর عَشِيًا)বিকাল) শব্দে আসর এবং تُظهرون)দুপুর) শব্দে যোহর নামাযের সময় উল্লেখ হয়েছে। (তাফসীর- ফাতহুল ক্বাদীর)

উক্ত আয়াত দুটি সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার ফযীলত একটি যয়ীফ (দুর্বল) হাদীসে বর্ণনা হয়েছে। আর তা হল এই যে, উক্ত আয়াত দুটি পড়লে দিবা-রাত্রির ছুটে যাওয়া আমল পূরণ হয়ে যায়। (যয়ীফ, আবু দাঊদ ১০৮১ নং)

কুরআনে সরাসরি 'পাঁচ' শব্দটি না থাকলেও যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা থেকে দৈনিক 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায' যে মুসলিমদের জন্য ফরজ করা হয়েছে তা স্পষ্ট। রাসূল (সাঃ) নিজে মসজিদে উপস্থিত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করেছেন এবং নামাজের প্রতিটি ধাপ কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে অন্যদেরকেও তা হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই বাস্তব শিক্ষাটি সব কালে এবং বর্তমানেও সেভাবেই পালন করা হচ্ছে। তাই ফরয নামাজের ওয়াক্ত নিয়ে কারো মধ্যেই তেমন কোন দ্বিমত নেই। আর ফরয নামাযের রাকাতের বিষয়টি এতটাই প্র্যাকটিকাল যে, সবকালেই পৃথিবীর

সর্বত্র সব মুসলিমই ফজরের ২ রাকাত, জুহুরের ৪ রাকাত, আছরের ৪ রাকাত, মাগরীবের ৩ রাকাত এবং ইশার ৪ রাকাত ফরজ নামাজ নির্দ্বিধায় আদায় করেছেন, এখনও করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। আল-কোরআনে (০৪:১০৩) সুনির্দিষ্ট সময়েই নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে। সেই দিকনির্দেশনা অনুসারে দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ের যে হিসেবে পাওয়া যায় তাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় সূচী স্পষ্টভাবেই বুঝে নেয়া যায়।

أقم الصلوة لدلوب الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

নামায কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার সময় (যোহর ও আসরের নামাজ) থেকে রাত্রির অন্ধকার [ক] পর্যন্ত (মাগরিব ও ইশার নামাজ) এবং প্রত্যুষের কোরআন পাঠ (ফজরের নামাজ); প্রকৃত পক্ষে প্রত্যুষের কোরআন পাঠ তো সাক্ষী-স্বরূপ।''

(সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত: ৭৮)

دُلُوكَ এর অর্থ, ঢলা (সূর্যঢলা) এবং غسق এর অর্থ, অন্ধকার। সূর্য ঢলার পর যোহর ও আসরের নামায এবং রাতের অন্ধকার পর্যন্ত বলতে মাগরেব ও এশার নামায উদ্দেশ্য। আর قرآن الفجر বলতে ফজরের নামায। এখানে কুরআন অর্থ নামায। ফজরের নামাযকে কুরআন বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, ফজরে কিরাআত পাঠ লম্বা হয়। এইভাবে এই আয়াতে পাঁচঅক্ত নামাযের কথা মোটামুটিভাবে এসে যায়। আর এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা হাদীসসমূহে পাওয়া যায় এবং তা বহুধাসূত্রে বর্ণিত উম্মতের পরম্পরাগত আমল দ্বারাও সাব্যস্ত।

অর্থাৎ, এই সময় ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন; বরং (এ সময়) দিনের ও রাতের ফিরিশতাগণ একত্রে মিলিত হন। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী, সূরা বনী ইস্রাইলের তাফসীর) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাতের ফিরিশতাগণ যখন আল্লাহর নিকট যান, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি ভালভাবে তা জানেন- "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?"

ফিরিশতাগণ বলেন, 'যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তারা নামাযে রত ছিল এবং যখন আমরা তাদের কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখনও তারা নামাযে রত ছিল।' (বুখারী)

কোন কোন সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করতে হবে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা-

১) ফজর - আয়াত নং (১৭:৭৮),(১১:১১৪), (৭:২০৫), (৩০:১৭), (৩৮:১৮) ও (৫০:৩৯)

২) জহুর - আয়াত নং (১৭:৭৮), (৩০:১৮) ও (৫০:৩৯)

৩) আছর - আয়াত নং (১১:১১৪), (০২:২৩৮), (৩০:১৭) ও (৩৮:১৮)

৪) মাগরিব - অ আয়াত নং নং (১৭:৭৮), (১১:১১৪) ও (০৭:২০৫)

৫) ইশা - আয়াত নং (১৭:৭৮), (১১:১১৪), (৩:৪), (৩০:১৮) ও (৫০:৪০)

৭.১. " ফজর নামাযের" নির্দেশ ও ফজর নামাযের ফযীলত

'আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে (ফজর) ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না।"

(সূরাআল-আ'রাফ; আয়াত:২০৫)

সুতরাং আল্লাহর মহিমা স্মরণ কর সূর্যাস্তের পূর্বে (যখন তোমরা সন্ধ্যায় পৌঁছাও) এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) (যখন তোমরা সকালে পৌঁছাও)।"

(সুরা আর রূম; আয়াত: ১৭)

''আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকালে (ফজর) ও বিকালে তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত;"

(সুরা ছোয়াদ; আয়াত১৮)

"অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং, সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন।"

(সূরা ক্বাফ; আয়াত:৩৯)

،حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَي وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه
وسلم - فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ
تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا . "ثُمَّ قَرَأَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.

জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ফাজর ও আসরের সলাতে তোমরা পরাভূত না হয়ে সামর্থ্যবান হলে তাই করো (সলাত কাযা করো না)। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ): "এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে"(সূরাহ কাফ; আয়াত:৩৯)। (বুখারী ৫৫৪, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৫৩৬; মুসলিম ৬৩৩, তিরমীযি,২৫৫১, আবূ দাঊদ ৩৭২৯, আহমাদ ১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭২৬। তাহকিক আলবানী: সহীহ)

৭.১.২ ফজর নামাযের ফযীলত

অন্যান্য নামায অপেক্ষা ফজর নামাযের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বেশি। যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত দান করবেন। অথাৎ সে আল্লাহর দিদার লাভ করবে, এবং জান্নাতি ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্নিমার রাতের আকাশের চাঁদের মতোই স্পষ্ট দেখবে। (বুখারী)

যে ব্যক্তি নিয়মিত ফজরের নামায আদায় করবে, সে কখোনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা। (সহিহ মুসলিম, ৬৩৪)

ফজরের নামায আদায়কারী, রাসূল (সাঃ)-এর বরকতের দোয়া লাভ করবেন (সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাযের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামায নেই। এশা ও ফজর নামাযে কী ফযীলত রয়েছে মানুষ যদি তা জানত তবে উক্ত নামাযে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ফজর নামাযে নামাযী মুনাফিকের তালিকা থেকে মুক্তিলাভ করে। ফজরের নামায মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যকারী, কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের জন্য ফজর নামায আদায় কষ্টকর

(বুখারী ৬৫৭,৬৪৪,২৪২০,৭২২৪; মুসলিম ৬৬১)

ফজরের সালাত আদায়ের ফলে ব্যক্তির মন ফুরফুরে, প্রফুল্ল হয়ে যায় (সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম)

ফজর সালাত আদায়ের জাগতিক উপকারের কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিট খুলে যায়, অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, অতঃপর সালাত আদায় করলে আরেকটি গিট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য নিয়ে।' (বুখারী, হাদিস: ১১৪২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন রাত্রির অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকল এবং যে ফজর সালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করল।" (সহীহ মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "ফজরের (সুন্নাত) দু'রাকাত সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম।" (সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিজি ৪১৬)

এই ফযীলত তো শুধু ফজরের দু'রাকাত সুন্নাতে তাহলে ফজরের ফরয সালাতের ফযীলত কী হতে পারে? নিশ্চয় সুন্নাতের চেয়ে ফরজের সাওয়াব অনেক বেশি ও উত্তম। এ সমস্ত হাদীস ফজর সালাতের বিরাট প্রতিদান ও গুরুত্বের দলীল।ফজর নামায আদায়কারী আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়

রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো।' (মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৯)

রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি ঐ দিন আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব (সহিহ মুসলিম, তিরমিজি ২১৮৪)

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।' (মুসলিম, হাদিস ১৩৭৭)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করবে, আল্লাহর ফেরেশতাগন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিকে ভালো মানুষ হিসেবে সাক্ষী দিবে। (বুখারী-মুসলিম)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজর সালাত জামাতের সাথে আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার আমলে দাঁড়িয়ে সারারাত নফল নামাজ আদায়ের সওয়াব দিয়ে দেন! (সহিহ মুসলিম-১০৯৬)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভোরে হেঁটে হেঁটে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে প্রবেশ করবে, তাআলা কিয়ামতের দিন তার জন্য পরিপূর্ণ আলো দান করবেন। (আবু দাউদ ৪৯৪)

৭.২. "যোহর নামাযের" নির্দেশ যোহর ও নামাজের ফজিলত

এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, নিশাকালে এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নে (যোহর) থাক। (সূরা আর-রূম; আয়াত:১৮)

যোহর নামাযের ফযীলত:

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরই অনেক উপকারীতা ও ফজিলত রয়েছে। তেমনি যোহর নামাযও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এর ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:

যোহরের সুন্নত নামাজ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি নিয়মিত যোহরের পূর্ব ও পরবর্তী চার রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে। দিবেন।" (তিরমিজী: ১/৫৫৩)

আয়েশা (রা) বলেন, "নবী করীম (সা) কখনোই জোহরের পূর্বের ও ফজরের পূর্বের সুন্নত নামাজ ছাড়তেন না।" (সহীহ বুখারী: ১১৮২)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যোহরের সুন্নাত নামাজ আদায় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নবী করীম (সা) বলেছেন, দৈনিক যোহরের নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করেন।

জুমার দিন যোহরের নামাজের পরিবর্তে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়। তাই এ ওয়াক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৩. "আসর নামাযের" নির্দেশ আসর ও নামাজের ফজিলত

"সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের (আসর) ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।"

(সূরা আল বাকারা; আয়াত:২৩৮)

অধিকন্তু, আল্লাহ সুনির্দিষ্টভাবে মধ্যবর্তী সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা অধিকাংশ সাহাবীগণের মতে আসরের সালাত।

"আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকালে ও বিকালে (আসর) তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত" (সূরা ছোয়াদ; আয়াত:১৮)

অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) আপনার পালন সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন।'

(সূরা ক্বাফ; আয়াত: ৩৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بن سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এ (এশার) নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশী ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয়ার চাঁদঅস্ত গেলে এ নামায আদায় করতেন। (মিশকাত-৬১৩, সহীহ্ আবূ দাঊদ-৪৪৫)

আসর নামাযের ফযীলত:

ফজর নামাযের মত আসর নামাযেরও বিশেষ মর্তবা রয়েছে-

ফজর আসর নামায আদায়কারীর কিয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার বা সাক্ষাৎ লাভ করবে।

জারির বিন আবদুল্লাহ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বর্ণনা করেন, 'একবার আমরা নবী করিম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ওই চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের ও অস্ত যাওয়ার আগের সালাত আদায় করতে পারলে তোমরা তা-ই করো। (বুখারী ৫৫৪, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৫৩৬; মুসলিম ৬৩৩, তিরমীযি,২৫৫১, আবূ দাঊদ ৩৭২৯, আহমাদ ১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭২৬। তাহকিক আলবানী: সহীহ)

এ সালাতের মাধ্যমে সকাল-বিকাল ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ লাভ করা যায় -

ফজর-আসরের সময় ফেরেশতাদের পালাবদল হয়। আর এ সময় বান্দা যা কিছু করে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে তা পেশ করে। এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরে বলেছেন, 'ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। জবাবে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজরত ছিলেন।' (বুখারি, হাদিস)

এ সালাতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায় -

বিখ্যাত তাবেয়ি আবু বকর বিন উমারাহ তাঁর পিতা রুআয়বাহ থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু ত 27 ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে।' (মুসলিম, হাদিস: ১৩২২)

৭.৪. "মাগরিবের নামাযের" নির্দেশ ও মাগরিবের নামাজের ফজিলত

''আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে (ফজর) ও সন্ধ্যায় (মাগরিব)। আর বে-খবর থেকো না।" (সূরা আল আ'রাফ; আয়াত:২০৫)

'আর নামায প্রতিষ্টা কর দিনের দুই প্রান্তেই (ফজর ও আছর) এবং রাতের নিকটবর্তী অংশে (মাগরিব ও ইশা); প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।' (সূরা হুদ; আয়াত:১১৪)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, 'আপনি অধিকহারে আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন। আর সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।' (সুরা আলে ইমরান; আয়াত: ৪১) তাফসিরবিদরা বলেন, এই আয়াতে পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজ আদায় করা। এই আয়াতে ফজর ও মাগরিবের নামাজের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ এ দুই সময়ে প্রকৃতিতে বড় দুটো পরিবর্তন হয়। দিন ও রাতের পালাবদল ঘটে।

সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, 'সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নবী (সা.)-এর ইমামতিতে মাগরিবের নামাজ আদায় করতাম।' (বুখারি, হাদিস: ৫৬১)

মাগরিবের নামাযের ফযীলত

মাগরিবের নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অন্যতম। সন্ধ্যায় সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেলে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর পশ্চিম আকাশে দিগন্তলালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পড়া যায়। তবে সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব।

হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে, যতদিন তারা মাগরিবের নামাজ আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব না করবে।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪১৮) অর্থাৎ যথাসম্ভব সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, বিলম্ব করা অনুচিত।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তায়ালা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারির উপকরণ প্রস্তুত করেন।' (বুখারি, হাদিস: ৬২২)

বর্ণিত আয়াত ও হাদিস থেকে সকাল-সন্ধ্যার ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত হাদিস থেকে এ-ও বোঝা যায়, মাগরিবের নামাজ অতি বরকতময়।

মাগরিবের ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজের কথা হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি এর ফজিলতও অপরিসীম। যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।

(তিরমিজি, হাদিস: ৬৩৬)

৭.৫."এশার নামাযের" নির্দেশ ও এশার নামাজের ফজিলত

"এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, নিশাকালে (এশা) এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নে (যোহর) থাক।" (সূরা আর-রূম; আয়াত:১৮)

"রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও।”

(সূরা ক্বাফ; আয়াত:৪০)

"আর নামায প্রতিষ্ঠা কর দিনের দুই প্রান্তেই (ফজর ও আসর) এবং রাতের নিকটবর্তী অংশে (মাগরিব ও এশা); প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।" (সূরা হুদ; আয়াত:১১৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ "

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এ (এশার) নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশী ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয়ার চাঁদঅস্ত গেলে এ নামায আদায় করতেন।

এশার সালাতের মাধ্যমে অর্ধ রজনী ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন রাত্রির অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকল" (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৭)

অন্য বর্ণনায় এসেছে "যে ব্যক্তি এশার সালাত ও ফজর সালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করল।" (সহীহ মুসলিম হাদিসঃ ৬৫৬)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এশা ও ফজর সালাতে কী ফযীলত রয়েছে মানুষ যদি তা জানত তবে উক্ত সালাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৮. জুমআর নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

৮. ১ জুমার নামাজের গুরুত্ব

جُمُعَة (জুমু`আহ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সম্মিলিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া। আর জুমার নামাজ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।

সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক মুমিন-মুসলমান একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে জামাতের সঙ্গে সে দিনের যোহরের নামাজের পরিবর্তে এই নামাজ ফরজরূপে আদায় করে, সে জন্য এই নামাজকে 'জুমার নামাজ'বলা হয়।

সপ্তাহের সেরা দিন শুক্রবার তথা জুমার দিন।

জুমআর দিনকে মুমিন মুসলমানের সপ্তাহিক ঈদের দিন বলা হয়ে থাকে। কারণ এ দিনটি তাদের সপ্তাহিক ইবাদতে দিন হিসেবে সাব্যস্ত। এ দিন ও জুমআর নামাজের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ফজিলত।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা জুমআর নির্দেশ দিয়ে কল্যাণের কথা তুলে ধরে বলেন-

'হে মুমিনগণ! জুমআর দিনে যখন নামাজের আজান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত (মসজিদে) ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সুরা জুমআ; আয়াত৯-১০)

জুমার দিনের সবচেয়ে বড় আমল তো হল, অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জুমার নামায আদায় করা। ভালোভাবে পাক-পবিত্র হয়ে পরিষ্কার ও উত্তম জামা-কাপড় পরিধান করে শুরু ওয়াক্তে মসজিদে চলে যাওয়া এবং নামায ও দুআ-যিকিরে মগ্ন থাকা। এরপর একাগ্রতার সাথে ইমাম সাহেবের খুতবা শোনা এবং উত্তমরূপে জুমার নামায আদায় করা। এটাই হল, জুমার দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক ফযীলতের আমল। হাদীস শরীফে এই আমলের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে।

এক সপ্তাহের গোনাহ মাফ হয়ে যায়

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

.الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

এক জুমা থেকে আরেক জুমা মধ্যবর্তী সময়ের (গোনাহের) জন্য কাফ্ফারা (পাপমোচনকারী), যদি কাবীরা গোনাহ না করা হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪১৪; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৮১৪)

সালমান ফারসী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

تَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ>؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. ثُمّ قَالَ<: تَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ
قُلْتُ: اللهُ عَزّ وَجَلّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْتُ فِي الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ: هُوَ الْيَوْمُ الّذِي
جُمِعَ فِيهِ أَبُوكَ أَوْ أَبُوكُمْ. قَالَ<: لَكِنّي أُخْبِرُكَ بِخَبَرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهّرُ ثُمّ
يَمْشِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمّ يُنْصِتُ، حَتّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ، إِلّا كَانَتْ كَفّارَةَ مَا بَيْنَهُ
.وَبَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الّتِي قَبْلَهَا، مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ

(قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.)

তুমি জানো, জুমার দিন কী?

উত্তর দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত আছেন।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, জুমার দিন কী?

আমি একই জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।

তিনি তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, বল তো জুমার দিন কী?

আমি তৃতীয়বার বা চতুর্থবার বললাম, জুমা হল ঐ দিন, যাতে আদম আলাইহিস সালামকে জমা করা হয়েছে। (অর্থাৎ তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে।)

তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এসব কিছু না।) বরং আমি তোমাকে জুমার দিনের খবর (আসল ফযীলত) সম্পর্কে অবগত করছি। কোনো মুসলিম যদি পবিত্র হয়ে জামে মসজিদের দিকে হাঁটতে থাকে, এরপর ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত নীরব থাকে তাহলে এ নামায এই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার গোনাহসমূহের কাফফারা (মোচনকারী) হয়ে যাবে, যদি ধ্বংসকারী তথা কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। (শারহু মুশকিলিল আছার, হাদীস ৩৮২৮; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৭৩২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৭২৯; সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদীস ১৬৭৭: মুজামে কাবীর, তবারানী ৬/২৩৭ (৬০৮৯) মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০২৮)

আবু সাঈদ খুদরী রা. ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطّ أَعْنَاقَ النّاسِ، ثُمّ صَلّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ، حَتّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الّتِي قَبْلَهَا.

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, তার কাছে থাকা সুন্দরতম জামাটি পরিধান করল এবং সংগ্রহে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করল, এরপর জুমাতে উপস্থিত হল, কারো কাঁধ ডিঙ্গিয়ে গেল না, তারপর আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী সুন্নত-নফল পড়ল, অতঃপর খতীব (খুতবার জন্য) বের হওয়া থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকল, তার এই নামায এ জুমা থেকে সামনের জুমা পর্যন্ত (গোনাহের) কাফফারা হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৭৬৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৭৭৮; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৭৬২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০৪৬৫

সালমান আলখায়ের (সালমান ফারসী) রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلّمَ الإِمَامُ، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى.

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করবে, সাধ্যমত পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে,৬ তেল ব্যবহার করবে বা নিজের ঘরে থাকা আতর মাখবে, এরপর জুমার দিকে বের হবে, (মসজিদে গিয়ে একসাথে থাকা) দুইজনের মাঝে গিয়ে বসবে না, যত রাকাত সম্ভব নামায পড়বে, এরপর ইমাম যখন খুতবা দেন তখন চুপ থাকবে। যে কেউই এসব করবে তাকেই এই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত মাফ করা হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৮৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৫৫৬৩)

দশ দিনের গোনাহ মাফ হয়ে যায়

আল্লাহ তাআলা রহমত ও মাগফিরাতের পরিধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর রাসূলের যবানে ঘোষণা শুনিয়েছেন, জুমার নামাযের বদৌলতে দশ দিনের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ الرّجُلُ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمّ تَطَيّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمّ خَرَجَ إِلَى الصّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمّ اسْتَمَعَ لِلْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ.

জুমার দিন যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করে, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করে এবং তার জামাগুলো থেকে ভালো জামাটি পরিধান করে, তারপর নামাযের উদ্দেশে বের হয়, (মসজিদে গিয়ে একসাথে থাকা) দুইজনের মাঝে গিয়ে বসে না, অতঃপর মনোযোগের সাথে ইমামের খুতবা শোনে, ঐ ব্যক্তির এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

(সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৪০৩)

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ تَوَضّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ، وَمَنْ مَسّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে, এরপর জুমায় উপস্থিত হবে, তারপর মনোযোগ দিয়ে (খুতবা) শুনবে এবং চুপ থাকবে, তার দুই জুমার মধ্যবর্তী দিনগুলো এবং আরো তিন দিনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর যে কঙ্কর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৫০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪৮৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১২৩১)

জুমার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা আবশ্যিক এবং তা একাকী আদায় করার নিয়ম নেই। কুরআনে জুমার নামাজের সময় হলে কাজ বন্ধ করে নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কারণবশত (যেমন খুব অসুস্থ ব্যক্তি) জুমা আদায় করতে না পারে তবে তার ক্ষেত্রে যুহরের নামাজ আদায় করা নিয়ম। তাছাড়া কিছু ক্ষেত্রে সুস্থ ব্যক্তির উপর, যেমন মুসাফির অবস্থায় জুমার আবশ্যকতা থাকে না এবং সেক্ষেত্রে যুহরের নামাজ আদায় করলে তা গ্রহণীয় হয়। তবে মুসাফির চাইলে জুমা আদায় করতে পারে।

৮.২. জুম্মার নামাজ না পড়লে যে শাস্তি

রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পরপর তিনটি জুমা বিনা ওজরে ও ইচ্ছা করে ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পর পর তিনটি জুমা পরিত্যাগ করবে, সে ইসলামকে পেছনের দিকে নিক্ষেপ করল। (মুসলিম)।

তবে আবার রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, চার শ্রেণির লোক ব্যতীত জুমার নামাজ ত্যাগ করা কবিরা গোনাহ। চার শ্রেণির লোক হল- ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মুসাফির ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। (আবু দাউদ)

৯. কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজের পরিচয় ও ফজিলত

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে সতেরো রাকাত ফরজ নামাজ, তিন রাকাত ওয়াজিব বিতির নামাজ, চার ওয়াক্তে বারো রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা নামাজ, দুই ওয়াক্তে আট রাকাত সুন্নতে জায়েদা নামাজ ছাড়া অন্যান্য নামাজ হলো নফল নামাজ। নফল নামাজের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত হলো নির্ধারিত নফল নামাজ; যথা: তাহাজ্জুদ নামাজ, ইশরাক নামাজ, চাশত নামাজ, জাওয়াল নামাজ, আউওয়াবিন নামাজ। এ ছাড়া রয়েছে আরও কিছু অনির্ধারিত নফল নামাজ। ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ ছাড়া বাকি সব নামাজকেই নফল নামাজ বলা হয়। (কিতাবুস সালাত)।

৯.১. তাহাজ্জুদ

ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নামাজ হলো তাহাজ্জুদ। পবিত্র কোরআনে তাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

কিয়ামুল লাইল- রাত জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায, মুমিনের মর্যাদার সিঁড়ি। জান্নাতের যাওয়ার অন্যতম উপায়। সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহর একান্ত ও প্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করতেন।

মুমিনের মর্যাদার সোপান

জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে নবীজির খেদমতে আসতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মাঝে ওহীর জ্ঞান ও ঊর্ধ্বজগতের খবর পৌঁছানোর গুরুদায়িত্বটা ন্যস্ত ছিল তাঁর কাঁধে। নবীজীর কাছে আসতেন এবং কিছু উপদেশ ও নসীহত শুনিয়ে আবার সরে যেতেন মানবপরিবেশ থেকে। একদিন উপদেশ শোনানোর পর তিনি নবীজীকে একটি অসাধারণ দর্শন জানালেন-

يَا مُحَمّدُ !شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللّيْلِ وَعِزّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النّاسِ.

إسناده حسن، وأشار إلى ثبوته الهيثمي :৩৩৩ /১ قال المنذري في الترغيب والترهيب ২/ ২৫৩ ،في مجمع الزوائد

হে মুহাম্মাদ! মুমিনের মর্যাদা কিয়ামুল লাইল- রাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় ও বিভিন্ন বন্দেগীর মধ্যে, আর তাঁর সম্মান মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষিতার মধ্যে।

(মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৯২১; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৪২৭৮)

ফরয নামাযের পরেই যার স্থান

পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুমিনের পরিচয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর পরই যে নামায আল্লাহর কাছে প্রিয় তা হল তাহাজ্জুদ। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন -

.أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ

রমযানের পর রোযা রাখার উত্তম সময় মুহাররম মাস আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৫)

যে আমল নবীজী কখনো ছাড়েননি

প্রিয় জিনিস কি কেউ কখনও ছাড়তে চায়? আর যদি সাথে যুক্ত হয় মজবুত ঈমান ও সওয়াবের আশা, হৃদয়ে থাকে প্রভুর প্রতি ভালবাসা এবং আমলের অদম্য প্রেরণা; তখন কঠিন কাজও হয়ে যায় অতি সহজ। হাঁ, আমাদের জন্য এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর জীবনসঙ্গীনী ও মুমিন-জননী হযরত আয়েশা রা. - এর জবান থেকেই এর একটি বিবরণ শুনুন। উরওয়া রাহ. বলেন, আয়েশা রা. বলেন –

كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ :لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ :أَفَلاَ أُحِبّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا.

(নবীজী) রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত বেশি নামায পড়তেন যে, তাঁর পাও মোবারক ফুলে যেতো। এ দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করছেন,

অথচ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার কি উচিত নয় যে, (এই মহা অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে) আমি একজন পূর্ণ শোকর আদায়কারী বান্দা হব?' (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮২০)

স্বেচ্ছায় তো ছাড়তেনই না, কখনো অনিচ্ছায় ছুটে গেলেও কাযা করে নিতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকেই বর্ণিত, রোগ-ব্যাধি কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারতেন, তবে দিনের বেলায় বারো রাকাত আদায় করে নিতেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৬)

অন্য বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে কাইস রা. - কে হযরত আয়েশা রা. বললেন-

ياعَبْدَ اللهِ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلّى قَاعِدًا.

হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে আদায় করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯)

পাপ মুছে দেয়

তাহাজ্জুদ গোনাহ মিটিয়ে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّيْلِ فَإِنّهُ دَأَبُ الصّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

তোমরা কিয়ামুল লাইলের প্রতি যত্নবান হও। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সালেহীনের অভ্যাস এবং রবের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। আর তা পাপরাশী মোচনকারী এবং গোনাহ থেকে বাধা প্রদানকারী। (জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৫৪৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১৫৬)

কিয়ামুল লাইল জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ.

সেদিন নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। (সূরা যারিয়াত; আয়াত ১৫) সাথে তাদের কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণও এসেছে। তন্মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-

وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (সূরা যারিয়াত; আয়াত: ১৮)

ইবাদুর রহমান-রহমানের বান্দাদের কতিপয় বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে। সেখানেও উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি বিবৃত হয়েছে-

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

আর তাঁরা রাত অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। (সূরা ফুরকান; আয়াত ৬৪)

সূরার শেষের দিকে তাদের পুরস্কারের বিবরণও এসেছে-

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا، خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا.

তাদের প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ। কারণ তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট!

(সূরা ফুরকান; আয়াত ৭৫-৭৬)

কিয়ামুল লাইল জান্নাত লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির আমল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, মানুষের সাথে

আমিও তাঁকে একনজর দেখবার জন্য বের হলাম। তাঁর চেহারা মোবারকের দিকে যখন তাকালাম, আমার বিশ্বাস হয়ে গেল, এ কোনো মিথ্যাবাদির চেহারা হতে পারে না। তখন তাঁর মুখে সর্বপ্রথম আমি যে কথাগুলো শুনেছি-

يَا أَيّهَا النّاسُ، أَفْشُوا السّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ، وَصَلّوا وَالنّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنّةَ بِسَلاَمٍ.

হে লোকসকল! সালামের প্রসার কর। মানুষকে আহার করাও! আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন তুমি নামায আদায় কর! তবেই নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (জামে তিরমিযি, হাদীস ২৪৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩২৫১)

অন্য হাদীসে পাওয়া যায়, উপরোক্ত গুণাবলী যাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, জান্নাতে থাকবে তাঁদের জন্য বিশেষ মর্যাদা। হযরত আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنّ فِي الْجَنّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصّيَامَ وَصَلّى وَالنّاسُ نِيَامٌ.

নিশ্চয়ই জান্নাতে রয়েছে এমন কিছু কক্ষ/প্রাসাদ, যার বাহির থেকে ভেতরাংশ দেখা যাবে, ভেতর থেকে বহিরাংশ দেখা যাবে। এগুলো আল্লাহ তাঁদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায়, কোমল ভাষায় কথা বলে, ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখে, সালামের প্রসার ঘটায় এবং রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তারা নামাযে দণ্ডায়মান থাকে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৯; জামে তিরমিযি, হাদীস ২৫২৭)

৯.২. ইশরাক:

ফজরের সালাত পড়ার পর সেই স্থানেই বসে, জিকির আজকার, দুআ দরূদ,

ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে থাকা। দুনিয়াবী কোন কথা না বলা। এভাবে যখন সূর্য উদিত হয়ে যায়। এর দশ বারো মিনিট পর যে দুই/চার রাকাআত সালাত পড়া হয় সেই সালাতকে ইশরাকের সালাত বলা হয়। তবে ফজর সালাত পড়ে

দুনিয়াবী কাজে মগ্ন হয়ে গেলে সূর্য উদিত হবার পর যদি ইশরাক পড়া হয় তবুও শুদ্ধ হবে। তবে সওয়াব কিছুটা কম হবে। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি সকালের নামায জামাতের সাথে আদায় করে এবং সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণে বসে থাকে, তারপর দুই রাকাত নামায আদায় করে, তার সওয়াব হজ্জ ও ওমরার সওয়াবের মত।তিনি বলেনঃ আল্লাহর রসূল বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালার সালাত ও দোয়া করবেন। তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক

তিনি বললেন: সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)।' (সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-৫৮৬)

খ. হযরত হাসান বিন আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত পড়ে, তারপর আল্লাহর জিকির করতে থাকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। তারপর দুই রাকাআত বা চার রাকাআত সালাত আদায় করে, তাহলে জাহান্নামের আগুণ তার চামড়া স্পর্শ করবে না। (শুয়াবুল ঈমান লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৩৬৭১)

৯.৩. সালাতুদ্দুহা বা চাশতের সালাত

সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠার পর যে সালাত আদায় করা হয়, তাকেই চাশতের সালাত বলে। আরবিতে বলে সালাতুদ্দুহা। এ সালাতের সময় শুরু হয় সূর্যোদয়ের পর এক বর্ষা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠে গেলে। পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার সামান্য সময় পূর্ব পর্যন্ত এ সালাতের সময় থাকে।

আবু যর (রাঃ) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন,

صدقة .وكل يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة .فكل تسبيحة صدقة .وكل تحميدة
ونهي عن المنكر صدقة . تهليلة صدقة .وكل تكبيرة صدقة .وأمر بالمعروف صدقة.
ويجزئ من ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى

তিনি বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় প্রভাব করে যে, তাকে তার প্রত্যেক জোড়াগুলোর পরিবর্তে সাদকাহ দেয়া লাগে। কাজেই প্রত্যেক বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা সাদকাহ হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবর' বলা সাদকা হিসেবে গণ্য হয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদকাহ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এসবের মুকাবিলায় চাশতের দু'রাকআ'ত সালাতই হবে যথেষ্ট (মুসলিম ৭২০)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু যারের সাথে দেখা করে বললাম: হে চাচা, কল্যাণ অর্জন করুন। তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেমন আপনি আমাকে বলেছিলেন। “যদি আপনি দুহা দুই রাকাত নামায পড়েন, তাহলে আপনাকে যুক্তিবাদী লোকদের মধ্যে গণ্য করা হবে না, এবং আপনি যদি এটি নামায পড়েন, তবে অবশ্যই আপনি নেক আমলকারীদের একজন হিসাবে লিপিবদ্ধ হবেন, যদিও আপনি এটি একটি সুন্নাত হিসাবে প্রার্থনা করেন, আপনি আনুগত্যকারীদের একজন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে, এবং যদি আপনি এটি আট রাকাআত করেন তবে আপনি সফলকামদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হবেন এবং আপনি যদি দশটি নামায পড়েন তবে সেদিন আপনার জন্য কোন গুনাহ লিপিবদ্ধ হবে না এবং যদি আপনি এটি দশ রাকআত করেন। "ঈশ্বর আপনাকে জান্নাতে একটি বাড়ি দান করুন।" আরও ৩ আরো তখন আমি তাকে বলি যে, হে চাচা! কল্যাণী উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে প্রশ্ন করছ। তখন তিনি বলেছিলেন, পড়বে না। আর যদি চার রাকাত পড়, তাহলে নিচের নেককারদের মাঝে গণ্য করা হবে। আর যদি আপনি পুরুষ রাকাত পড়ুন, তাহলে উপযুক্ত আনুগত্ যোগ দেবেন আর যদি তুমি আট রাকাত পড়, তাহলে চেষ্টা করবে সফলকামব

অয়ক্তিদের নাম লেখা হবে। আর যদি পড়তে পড়তে, তাহলে আপনার আমলনামা কোন গোনাহ লেখা হবে না। আর যদি বার রাকাত পড় তাহলে তোমার জন্য জান্নাতের একটি ঘর নির্মাণ করতে হবে। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, সংখ্যা নং-৪১০৬, মাউয়্যা যোগেদ, সদস্য নং-৩৪১৮, ১৯, মুসনদুল ফডর, সদস্য নং-৩৮৯০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال :أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلَّمَ
وصلاة الضحى ركعتين، وصوم ثلاثةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. بِثَلَاثٍ الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ

হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ

দিয়েছেন। ঘুমের আগে বিতর পড়া। চাশতের নামায দুই রাকাত পড়া এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা। (মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুয়া, হাদীস নং-১১, সুনানে দারামী, হাদীস নং-১৪৯৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-১৫৩৬)

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বারো রাকাত দুহা পড়বে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি সোনার প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। "

হযরত আনাস বিন মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি চাশতের নামায বার রাকাত পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি অট্টালিকা তৈরী করে দিবেন (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৩৮০, সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-৪৭৩)

৯.৪. জাওয়াল

'জাওয়াল' অর্থ হলো স্থানান্তর, স্থানচ্যুতি, পরিবর্তন, আবর্তন, সরে যাওয়া ও হেলে যাওয়া ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় জাওয়াল হলো দিনের তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভ, মধ্যাহ্নোত্তর, অপরাহ্নের সূচনা সময়; দিনের মধ্যভাগে বা দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর

থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যায়। এই সময়কে ওয়াজুজ জাওয়াল বলা হয়। এটি মূলত মধ্যদিনের সিজদা ও নামাজ নিষিদ্ধ সময়ের পর জোহরের ওয়াক্তের সূচনাপর্ব। এ সময় যে নফল নামাজ আদায় করা হয়, তাকে জাওয়ালের নামাজ বলা হয়।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) সর্বদা সূর্য ঢলে পড়ার পর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আপনি সদা সূর্য হেলে পড়লে চার রাকাত নামাজ কেন আদায় করেন? তিনি (সা.) বললেন, সূর্য ঢলে পড়লে আসমানের দরজা খোলা হয়, এরপর জোহর নামাজ পর্যন্ত তা বন্ধ করা হয় না। আমি চাই, ওই সময়ে আমার কোনো নেক আমল ওপরে যাক। (ইবনু মাজাহ: ১১৫৭) জাওয়াল নামাজ চার রাকাত, দুই রাকাত পড়লেও তা নামাজরূপে পরিগণিত হয়।

৯.৫. আউয়াবিন

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নাত পড়ার পর থেকে ইশার সময় হবার আগ পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয়, সেটাকে আওয়াবীন নামায বলা হয়। তবে কিছু হাদীসে চাশতের নামাযকেও আওয়াবীন নামায বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাকি আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ হল, চাশতের নামায আলাদা আর আওয়াবীন নামায স্বতন্ত্র।

চাশতের নামাযের সময় হল সূর্য উদিত হয়ে রোদ তীব্র হবার পর পড়া হয়। আর আওয়াবীন নামায মাগরিবের ফরজের পর পড়া হয়।

এ নামায হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে রাকাত সংখ্যা নির্ধারিত নয়। ছয় রাকাতের ফযীলত হাদীসে আসছে। আবার এর চেয়ে কমবেশিও করা যাবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ :»أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءُ

হযরত হুযাইফা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মাগরিব নামায আদায় করলেন। ফরজ শেষে তিনি নফল পড়তে লাগলেন ইশা পর্যন্ত। (সহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদীস নং - ১১৯৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَغْرِبِ لَا يَتَكَلَّمُ

আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছয় রাকাত নামায মাগরিবের পর পড়বে, যার মাঝে আল্লাহর জিকির ছাড়া কোন কথা বলে না, তাহলে সে বার বছর ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। (সহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদীস নং – ১১৯৫)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর ছয় রাকাত সালাত আদায় করে সে কোন বিষয়ে কথা বলে না।

বারো বছর উপাসনার সময় তারা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়ে, যার মাঝে কোন মন্দ কথা বলে না, তাহলে সে বার বছরের ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। (সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-৪৩৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৩৭৪)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ :»صَلاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَلْتَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَثُوبَ إِلَى الْعِشَاءِ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সালাতুল আওয়াবীন' হল মাগরিবের নামায পড়ে ফারিগ হবার পর থেকে নিয়ে ইশার নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত যে নামায পড়া হয় তাকে বলে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৫৯২২) ইবনুল মুনকাদির এবং আবু হাযিম বলেন: "তাদের পাশ তাদের বিছানা থেকে দূরে

থাকা উচিত।” (আল-সাজদাহ; আয়াত:১৬) “এটি সূর্যাস্তের নামায এবং সন্ধ্যার নামাযের মধ্যে, যে নামাযে ফিরে আসে তার সালাত। "

ইবনুল মুনকাদির এবং আবু হাযেম বলেন, সূরা সাজদার ১৬ নং আয়াত (তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে।) আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে নামায মাগরিব ও ইশার মাঝখানে পড়া হয়। সেটা হল আওয়াবীনের নামায। (শুয়াবুল ঈমান লিলবায়হাকী, হাদীস নং-২৮৪০, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৪৮১৩)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :»إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَحُبُّ بِالَّذِينَ يُصَلُّونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় ফেরেশতাগণ ঐ লোকদের ঘিরে রাখে, যারা মাগরিব ও ইশার মাঝখানে নামায পড়ে। আর এটা সালাতুল আওয়াবীন। (শরহুস সুন্নাহ লিলবাগাবী, হাদীস নং-৮৯৭)

৯.৬. তাহিয়্যাতুল অজু

অজুর মাধ্যমে অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুই রাকাত নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজকে বলা হয় তাহিয়্যাতুল অজু। নিষিদ্ধ সময়ের বাইরে যেকোনো সময় এই নামাজ আদায়ের অবকাশ রয়েছে। রাসুলে করিম (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ আদায় করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৩৪)

১০. জামাতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত

জামা’আত” শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসের আধিক্য। তেমনিভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কোথাও একত্রিত হওয়াকেও “জামা’আত” বলে আখ্যায়িত করা হয়। শরী’আতের পরিভাষায় “জামা’আত” বলতে সালাত আদায়ের

উদ্দেশ্যে দু' (ইমাম ও মুক্তাদি) বা ততোধিক ব্যক্তির মসজিদ অথবা সেরূপ কোনো জায়গায় একই সময়ে একত্রিত হওয়াকে বুঝানো হয়।

১০. ১.জামাতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামা'আতে আদায় করা সকল সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুরুষের জন্য ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ রহ, তার কিতাবুস সালাতে একটি ঘটনাটি বর্ণনা করেন। যার মূল বর্ণনা রয়েছে সহীহ মুসলিমে। ইমাম আহমাদ বলেন, "আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে: সে বলল হে আল্লাহর রাসূল, আমি একজন দৃষ্টি শক্তিহীন, দুর্বল শরীর এবং বৃদ্ধ মানুষ, বাড়ীও দূরে, মসজিদ ও আমার মাঝে খেজুর গাছ এবং খালও রয়েছে। অতএব, আমি বাড়ীতেই সালাত আদায় করব এই অনুমতি কি রয়েছে?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "তুমি কি আযান শুন'?" সে বলল জি হ্যাঁ, তিনি কললেন: "তবে মসজিদে আসতে হবে।"

ইমাম আহমদ উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা শেষে বলেন, "যদি কারো জন্য সালাতের জামা'আত থেকে বিরত থাকার সুযোগ থাকতো তবে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বৃদ্ধ, দুর্বল শরীর, দৃষ্টি শক্তিহীন, বাড়ী দূরে অবস্থিত এবং তার ও মসজিদের মাঝে অনেক খেজুর গাছ ও খাল বিদ্যমান ব্যক্তিটিকে অনুমতি দিতেন। (ইমাম আহমদের উক্তি এ পর্যন্ত)

এই স্পষ্ট সহীহ হাদীস থেকে বোঝা যায় কারো জন্য সালাতের জামা'আত থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ ব্যক্তির ওযর গ্রহণও করতেন তবুও কোনো সুস্থ-সবল ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জামা'আত থেকে বিরত থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য হতো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তার ওযর প্রত্যাখ্যান করে তাকে মসজিদের জামাতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিলেন, আর তাঁর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

মসজিদে জামা'আতবদ্ধভাবে সালাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ "যে ব্যক্তি আযান শুনল অতঃপর শর'ঈ ওযর ব্যতীত মসজিদে উপস্থিত হলো না তার সালাত হবে না।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ)

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, শর'ঈ ওযর কী? তিনি বলেন, ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা।

১০.২. জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ফযিলত

জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ফযিলত অনেক। কেউ যদি জামাতের সাথে সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে গিয়ে সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তার জন্য রয়েছে অনেক বড় সুসংবাদ।

১. সালাতের জন্য অপক্ষো করলে ফিরিশতাগণ ক্ষমা এবং রহমতের দুআ' করেন, হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ وَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ .حَتَّى يَنْصَرِفَ . أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সালাতের জন্য সালাতের স্থানে বসে অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে হে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাঁকে রহমত করুন। সে ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের স্থান ত্যাগ না করেন অথবা ওযু নষ্ট না করেন। (সহীহ মুসলিম; হাদিস: ১৫৪১)

২. প্রতি কদমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি ফরয সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে ওযু করে বের হয় তার একটি কদমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং অপর কদমে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। (সহীহ মুসলিম; হাদিস: ১৫৫৩)

৩. একাকী সালাত পড়ার চেয়ে জামাতে পড়লে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জামাতে সালাত আদায়ের ফযিলত একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব হয়। (সহীহ বুখারী; হাদিস: ৬৪৫)

৪. যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সালাতুল ইশা এবং ফজর আদায় করল সে যেন পুরো রাত নফল সালাত আদায় করল:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামআতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত পর্যন্ত নফল সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাতও জামআতের সাথে করল, সে যেন সারারাত নফল সালাত আদায় করল।

(সহীহ মুসলিম; হাদীস-১৫২৩)

৫. জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে ইহরাম বেঁধে হজ্বে গমন করার সমান সওয়াব:

আরেকটি হাদীসে এসেছে –

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ

হযরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি ঘর থেকে উত্তমভাবে ওযূ করে বের হয়ে ফরয সালাতের জন্য মসজিদে গমন করে (জামাতের সাথে সালাত আদায় করে) তার বিনিময় হলো ইহরাম বেঁধে হজ্জে গমন করার সমান সওয়াব। আর যে ব্যক্তি সালাতুদ দোহা আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয় তার বিনিময় হল ওমরা আদায় করার সমান সওয়াব।

(সুনানে আবু দাউদ; হাদিস: ৫৫৮)

৬. একনাগাড়ে চল্লিশ দিন জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকবীরে উলার সাথে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জামাতে সালাত আদায় করবে তার জন্য দুটি সনদ রয়েছে। একটি হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। অপরটি হচ্ছে মুনাফিকি থেকে মুক্তির সনদ। (সুনানে তিরমিজি; হাদিস২৪১)

১০.৩. জামাতে সালাত আদায় না করার পরিণাম

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিতে চান: হাদীসে এসেছে -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ امُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন। আমার ইচ্ছা হয় কিছু সংখ্যক যুবককে অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনতে বলি। তারপর সালাতের নির্দেশ প্রদান করি। সালাতের ইকামত দেওয়া হবে। তারপর একজনকে নির্দেশ প্রদান করি যে সে যেন লোকদেরকে ইমামতি করে সালাত আদায় করে। এরপর আমি ঐ সব লোকের কাছে যাই যারা অকারণে জামাতে না গিয়ে ঘরে সালাত আদায় করে নেয় এবং তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেই। (সহীহ বুখারী; হাদিস: ৬৪৪)

২. অকারণে জামাতে না গেলে সালাত কবুল হয় না: হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে আমার সালাত কোনো রকম কারণ ব্যতীত জামাতে উপস্থিত না হয়, তার সালাত কবূল হয় না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ বলতে কি বুঝায়? তিনি জবাব দিলেন অসুস্থতা, ভয়, ভীতি।

(সুনানে আবু দাউদ; হাদিস; ৫৫১)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অভিমত: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি সারাদিন সিয়াম পালন করে এবং সারারাত

নফল সালাত পড়ে কিন্তু জুমআ এবং জামাতে উপস্থিত হয় না, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে একথা বললেন, ঐ লোকটি জাহান্নামী। (তিরমিজি)

১১. সালাতে একাগ্রতার গুরুত্ব

খুশু হল-আল্লাহর ভয় এবং ধ্যান হতে সৃষ্ট স্থিরতা, গাম্ভীর্যতা ও নম্রতা। ('দার-আশশুআব প্রকাশিত ইবনে কাসির: ৬/৪১৪)।সালাতের ভেতর খুশু একমাত্র তারই অর্জিত হবে, যে সবকিছু ত্যাগ করে নিজেকে সালাতের জন্য ফারেগ করে নিবে এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে সালাতকে স্থান দিবে। তখনই সালাতের দ্বারা চোখ জুড়াবে, অন্তর ঠান্ডা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وجعلت قرة عيني في الصلاة .مسند أحمد (١٢٨/٣) সালাতেই আমার চোখের শান্তি রাখা হয়েছে। (মুসনাদু আহমাদ: ৩/১২৮)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মনোনীত বান্দাদের আলোচনায় খুশুর সহিত সালাত আদায়কারী নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য ধার্যকৃত ক্ষমা ও সুমহান প্রতিদানের ঘোষণা প্রদান করেছেন। (সূরা আল-আহজাব ৩৫) খুশু বান্দার উপর সালাতের দায়িত্বটি স্বাভাবিক ও হালকা করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. (البقرة :٤٥) আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা খুশুওয়ালা-বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। (সূরা আল- বাকারা: ৪৫)

অর্থাৎ সালাতের কষ্ট বড় কঠিন, তবে খুশু ওলাদের জন্য কোন কষ্টই নয়।" (তাফসিরে ইবনে কাসির (১/১২৫) খুশু যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন কঠিন ও দূর্লভ

নামাযে খুশু-খুযু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন-হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক তাকীদ করা হয়েছে। খুশু-খুযুর দুটি অংশ রয়েছে এক. নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা। দুই. মনোযোগ ও একাগ্রতা রক্ষা করা। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের সাথে যে নামায আদায় করা হয় তাকে খুশু-খুযুযুক্ত নামায বলে।

নামাজে একাগ্রতা দুটি স্তর রয়েছে। যথা: ১ – সর্বোচ্চ স্তর। এটা ইহসানের হালত। এই অবস্থার বর্ণনা হাদিসে এভাবে এসেছে: “তুমি এমন ভাবে ইবাদত করো, যে আল্লাহকে তোমার সামনে দেখছো, আর যদি না দেখে থাকো, (অর্থাৎ, তোমার যদি ঐরকম অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে এটা অনুভব করো যে,) আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এই দুই অবস্থার কোন এক অবস্থা যদি ইবাদতে তৈরি হয়, তাহলে সেটা হবে ইবাদতের সর্বোচ্চ স্তর। ১ – সর্বনিম্ন স্তর। এটা ঐ অবস্থা, যখন নামাজি তার নামাজে পাঠ করা প্রতিটি সূরা ও তাসবীহের প্রতি মনোযোগ রেখে নামাজ পড়ে। কখনো মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলে আবার মনোযোগ নিবদ্ধ করে।

এটা ইবাদতের সর্বনিম্ন স্তর। স্বভাবতই প্রথমেই কেউ লাফ দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে না। ধাপে ধাপে সামনে এগোতে হয়। এজন্য শুরু করতে হবে প্রথম স্তর থেকে। এর সাথে নামাজের পর দুটি কাজ করতে করতে হবে নিয়মিত। তাহলে খুব সহজেই পৌঁছা যাবে সর্বোচ্চ স্তর ইহসানের হালতে।

দুটি কাজ হলো: ১ – নামাজের পর শোকর করতে হবে। এই চিন্তা-বোধ থেকে যে, আমার তো নামাজে আসার ক্ষমতা ছিল না, কিংবা মনও চাচ্ছিলো না কষ্ট করে এসে নামাজে শরিক হতে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাওফিক দিয়েছেন। তাই, আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আর, আল্লাহ তো বলেছেন:

وَ اِذۡ تَاَذَّنَ رَبُّکُمۡ لَئِنۡ شَکَرۡتُمۡ لَاَزِیۡدَنَّکُمۡ وَ لَئِنۡ کَفَرۡتُمۡ اِنَّ عَذَابِیۡ لَشَدِیۡدٌ

‘আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন- ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের (নেয়ামত) বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন।’ (সুরা ইবরাহিম; আয়াত০৭)

নামাজ আদায়ের পর যদি আল্লাহর শোকর করা হয়, তাহলে আল্লাহ নামাজ আদায়ের তাওফিক আরো বাড়িয়ে দেবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা।

২ – আল্লাহর শান মোতাবেক যথাযথভাবে (যেটা কখনো পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়।) ইবাদত করতে না পারার কারণে, আল্লাহর কাছে ইসতেগফার করা।

নামাজের পর। নামাজের প্রতিটি রুকন এর প্রতি খেয়াল করে চিন্তা করা, আমার কিয়াম, আমার রুকু, আমার তেলাওয়াত–কি যথাযথ আদায় হলো? নিজে নিজের নামাজের হিসাব নেওয়া।

এরপর খাঁটি দিলে, নিজের দূর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এজন্য রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পর তিন বার ইসতেগফার করতেন। আর আল্লাহ তো ওয়াদা করেছেন, যতো বড় গোনাহ কিংবা ত্রুটি হোক না কেন, (যদি খাঁটি দিলে ইসতেগফার করা হয়) তাহলে তাহলে আল্লাহ সব ক্ষমা করে দেন।

একাগ্রচিত্ত নামাযের বাস্তব উদাহরণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায।

হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের বর্ণনা দেন, তিনি বলেনঃ আমি এক রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন এবং একশত আয়াত পড়লেন। তিনি রুকু না করে সামনে চললেন। আমি ভাবলাম তা তিনি দু’রাকআতে শেষ করবেন ও তারপর তিনি রুকু করবেন। তিনি চলতে থাকলেন, এমন কি সূরা নিসা শেষ করলেন। অতঃপর সূরা আলে ইমরান। তারপর তিনি রুকু করলেন তার কিয়ামের কাছাকাছি সময় নিয়ে।

তিনি রুকুতে বলছিলেনঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

(সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম),

পরে তিনি তাঁর মাথা ওঠালেন এবং বললেনঃ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ

(সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ), এরপর কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদা করলেন এবং সিজদা লম্বা করলেন। আর সিজদায় বলছিলেনঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

(সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা),

তিনি আল্লাহর ভয় অথবা তাযীমের-আয়াতে পৌছলেই তাঁকে স্মরণ করতেন। (বায়হাকী)।

অন্য হাদীসে এসেছে যেঃ তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন, সূরা বাকারা পাঠকালে যখন রহমতের আয়াতে পৌঁছেন, তখন তিনি তথায় থেমে রহমত কামনা করেন এবং যখন কোন আযাবের আয়াতে পৌঁছেন, তখন তিনি তথায় থেমে আযাব হতে মাগফিরাত কামনা করতেন। অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকুতে অতিবাহিত করেন (মুসনাদে আহমাদ)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায ও আল্লাহর সমীপে দন্ডায়মান হওয়ার প্রতি ভালোবাসার কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায়, বস্তুত তিনি যখন একা নামায পড়তেন তখন অনেক লম্বা সময় নিয়ে নামায আদায় করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নামায আদায় করা সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রির একাংশে (নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা ফুলে ফাটার উপক্রম হয়ে পড়ত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন? অথচ আপনার তো পূর্ব ও পরের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বললেন, "আমি কি শুকরগুযার বান্দা হব না?"। (সহীহ বুখারী)। কেনই বা করবেন না, তিনিই তো বলেছেনঃ "নামাযকে করা হয়েছে

আমার চক্ষুশীতলতা” । (মুসনাদে আহমাদ)। আর তাঁর চক্ষুশীতলতা হলো নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা, তাঁর ইবাদাত করা, তাঁর প্রতি একাগ্র ও কায়মনোবাক্য হওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে ফরজ নামাযে ইমামতি করতেন তখন তিনি খুব সংক্ষেপ করতেন, তিনি তাঁর মুক্তাদিদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রাখতেন, এবং তাদের প্রতি দয়াদ্র হতেন। এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুক্তাদিদের জন্য নামাযের জামাতকে সহজ করার উপদেশ দিয়েছেন, তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা তাঁদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী নামায আদায় করে তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় দীর্ঘ করার নিয়ত করে নামায শুরু করতেন, অতঃপর শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। তিনি বলেনঃ আমি নামায পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি। ফলে আমি তার মায়ের কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে করে নামায সংক্ষিপ্ত করি। (সহীহ বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামতি করলে নামায খুব সংক্ষেপ করতেন আর একা পড়লে এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যে তাঁর পা ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে খুশু তথা গভীর মনোযোগ ও একাগ্রতা রক্ষা করতেন, তিনি বিনয়াবনত এবং আপাত-মস্তক দীনতাসহ আল্লাহর সমীপে দন্ডায়মান হতেন এবং তিনি সাহাবীদের তা শিখিয়েছেন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে লাগল, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি বললেনঃ ফিরে যাও

এবং নামায আদায় করে নাও। কেননা, তুমি নামায আদায় করনি। তখন সে ফিরে গেল এবং নামায আদায় করল। পুনরায় এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি উত্তরে বললেনঃ তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করে নাও। কেননা, তুমি নামায আদায় করনি। তৃতীয়বার লোকটি বলল, দয়া করে আমাকে অবহিত করে দিন। তিনি বললেনঃ যখন তুমি নামাযে দণ্ডায়মান হবে তখন খুব ভালভাবে অযু করে নেবে। এরপর কিবলামুখী হবে। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। এরপর কুরআন মজীদ থেকে যা তোমার জন্য সহজ তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। এরপর মাথা উত্তোলন করবে। এমনকি সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে ধীরস্হিরভাবে। এরপর (সিজদা থেকে) মাথা উত্তোলন করবেঃ এমন কি সোজা হয়ে এবং ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পূনরায় সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবে। এমন কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমার সমস্ত নামাযই এরূপ করবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের প্রত্যেক রুকনে খুশু তথা একাগ্রতা ও ধীরস্থিরতা রক্ষার হুকুম দিয়েছেন, এবং সেটিকে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত আখ্যা দিয়েছেন, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি রুকূ হতে উঠার পর সোজা হয়ে দাঁড়াবে না এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বিরতির সময় সোজা হয়ে বসবে না তার নামায যথেষ্ট হবে না। (আবূ দাউদ), যে ব্যক্তি তা করে না তাকে চোর বলে আখ্যায়িত করেছেন, তিনি বলেনঃ চোরদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম চোর হল সেই ব্যক্তি যে নামায চুরি করে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের চুরি কিভাবে হয়? তিনি বললেন, নামাযের চুরি হলো রুকূ'-সিজদা পূর্ণরূপে না করা।

(মুসনাদে আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এমন অনেক লোক আছে যারা নামায পড়ে কিন্তু তাদের নামায পুরাপুরি কবুল না হওয়ায় পরিপূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হয় না।

বরং তাদের কেউ ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, 8 ভাগের ১ ভাগ, তিনের-একাংশ বা অর্ধাংশ সাওয়াব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (আবূ দাউদ - সুনানে নাসাঈ)

তিনি নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় ধীরস্থীরতা ও গাম্ভীর্যতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেনঃ যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন নামায এর দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত ধীরস্থীরতা ও গাম্ভীর্যতা বজায় রাখা। তাড়াহুড়া করবেনা। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করে নিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এক ব্যাক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকূ' ও সিজদা ঠিকমত আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, তোমার নামায হয়নি, যদি তুমি (এই অবস্থায়) মারা যাও, তাহলে আল্লাহ্ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে। (সহীহ বুখারী)

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অধিক নামায আদায় করতেন। কেননা এই সময়টি ছিল তাঁর ও তাঁর প্রতিপালকের একান্ত মুহুর্ত। এ কারণে তিনি রাতের নামাজ সম্পর্কে বলেন,

أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل

'ফরয নামায গুলোর পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হলো রাতের নামায"।

(সুনানে আবু দাউদ: ২৪২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৪৮৮)

রাতের নামাজের সীমাহীন পছন্দের কারণে তার যদি কোন কারণে কোন নামাজ কাজা হয়ে যেত, তাহলে তিনি সেটা প্রভাতে আদায় করে নিতেন।

নামাযের প্রতি নবীজির এই বিশেষ ভালোবাসা আরও ভালো করে বোঝা যায় বিলাল রাঃ কে তাঁর এ কথা বলার মাধ্যমে- "হে বেলাল, তুমি দাঁড়াও, (অজান ও ইকামত দাও) এবং নামাজে মাধ্যমে আমাদের হৃদয়কে শান্ত করো।"

(সুনানে আবু দাউদ ৪৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ: ২৩১৩৭, আল মুজামুল কবির: ৬২১৫)

আচ্ছা, নামায তো আমরাও পড়ি। নামাযের জন্য প্রতিদিনই আমরা আমাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করি। কিন্তু আমাদের এই নামায কি আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করে? এমনটা কয়দিন হয়েছে, নামায পড়ে মনে খুব পরিতৃপ্তি অনুভব হয়েছে? আসলে নামাজের প্রকৃত পরিচয়টাই আমাদের অজানা। আমরা নামাযের নিয়মকানুন জানলেও জানি না কীভাবে নবীজি (সা.) নামাযকে উপভোগ করতেন। ফলে আমাদের নামায হয়ত হয়ে যায়, কিন্তু সেই নামাজে প্রাণ থাকে না। আমাদের ভিতর রেখাপাত করে না, জীবনে কোনো পরিবর্তন আনে না। আমাদের নামাযকে ফলপ্রসূ করতে হলে রাসুলুলাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামের নামাযঃ

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপদেশ চাইলে তিনি বলেন " যখন নামাযে দাঁড়াবে, জীবনের শেষ নামায মনে করে পড়বে। সাহাবাকেরাম রাঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং হুবুহু পালনে সচেষ্ট থাকতেন। তাই তাঁরা নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। রাসূল সাল্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহবতে তাঁদের নামায ও নামাযের বাইরের জীবন অতুলনীয় ঈমানের দ্যুতি ছড়িয়ে গেছে যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় -

১. হযরত আবু বকর (রা) খুটির মত নিশ্চল হয়ে নামাযে দাঁড়াতেন।

২. বল্লমের আঘাতে বেহুশ থাকা অবস্থায় হযরত ওমর (রা) কে নামাযের কথা বললে তিনি হুঁশ ফিরে পান।

৩. হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকারীদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর বিবি বললেন "তোমরা এমন লোককে হত্যা করলে যে রাতের নামাযে কুরআন খতম করতেন।

৪. হযরত আলী (রা) এর পায়ে বিদ্ধ তীর সিজদারত অবস্থায় সহজে খোলা গেল।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অসুস্থ অবস্থায় চোখের চিকিৎসা ত্যাগ করলেন, কারণ চিকিৎসক সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সিজদা দিতে নিষেধ করেছিলেন।

৬. হযরত আবদুল্লহ ইবনে যুবাইর (রা) নিশ্চল থমের মত দাঁড়াতেন এবং বলতেন এটাই খুশু।

সালাফে সালেহীন বা সৎপূর্বসূরীদের নামাজ:

১। সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার সালাতের জামা'আত ছুটে নি।"

২। আবু হাইয়্যান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাবী'ঈ ইবন খুসাইমকে পক্ষাঘাত (রোগ) অবস্থায় সালাতের জন্য (মসজিদে) নিয়ে আসা হত, তাকে বলা হয়েছিল যে, আপনার জন্য বাড়ীতে সালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। তিনি বলেন আমি তো "পহাইয়্যা 'আলাস সালাহ" শুনতে পাই, তোমাদের যদি সালাতে পৌঁছার সমর্থ থাকে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সালাতে উপস্থিত হও।"

৩। ইবরাহীম আত-তাইমী রহ. বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তিকে সালাতের তাকবীরে উলায় (প্রথম) অংশ গ্রহণে অলসতা করতে দেখ তবে তার থেকে বিমূখ হয়ে যাও।"

৪। মুস'আব বলেন, 'আমের মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলেন, আমার হাত ধর, (মসজিদে যাওয়ার জন্য) তাকে বলা হলো: আপনি তো অসুস্থ। তিনি বললেন: আমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনব আর সে আহ্বানে সাড়া দিব না? লোকেরা তার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেল। তিনি মাগরিব সালাতে ইমামের সাথে যোগ দিলেন এবং এক রাকাত সালাত আদায় করার পর মারা যান, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। (এই ব্যক্তি হলেন আমের ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম)

৫। ওয়াকী' ইবন জাররাহ বলেন, "আ'মাশের বয়স যখন প্রায় সত্তর বছর হয়েছিল তবুও তার (সালাতে) তাকবীরে উলা ছুটে নি।"

৬। মুহাম্মাদ ইবন মুবারক বলেন, "সা'ঈদ ইবন আব্দুল আযীযের সালাতের জামা'আত ছুটে গেলে তিনি কাঁদতেন।"

৭। গাস্সান বলেন, আমার নিকট আমার ভ্রাতুস্পুত্র বিশর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা বিশর ইবন মানসুর বাসরীকে তাকবীরে উলা ছুটেছে দেখি নি।"

১২. সময়মতো নামাজ পড়ার গুরুত্ব

সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা একজন মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব। নামাজ না পড়ার শাস্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করা হবে– 'কেন তোমরা সাকার নামক জাহান্নামে এলে? তারা বলবে, আমরা তো নামাজি ছিলাম না এবং আমরা মিসকিনদের খাবার দিতাম না; বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সঙ্গে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। এমনকি আমরা প্রতিদান দিবসকে (কেয়ামত) অস্বীকার করতাম। আর এভাবেই হঠাৎ আমাদের মৃত্যু এসে গেল।' (সুরা মুদ্দাসসির আয়াত ৩৮-৪৭)

সময়মতো নামাজ আদায়ের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নামাজ মুমিনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।' (সুরা নিসা; আয়াত, ১০৩)

সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করবে, আর অবহেলার কারণে এর কোনোটি পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (যথাযথভাবে) আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস ১৪২০)

সময়মতো নামাজ আদায় করলে আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করেন বলেন জানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বর্ণিত হয়েছে, 'মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত

নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে নির্ধারিত সময়ে পূর্ণরূপে রুকু ও পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন, অন্যথায় শাস্তি দেবেন।’ (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস ৪২৫)

এছাড়াও সময়মতো নামাজ আদায়কে সর্বোত্তম আমল বলে অভিহিত করা হয়েছে। হজরত উম্মু ফারওয়া (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, নামাজের সময় ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায় করা। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস ৪২৬)

সময়মতো নামাজ আদায়ের জন্য যারা সময়ের আগেই মসজিদে উপস্থিত হয় এবং নামাজের জন্য অপেক্ষা করে ফেরেশতারা তাদের জন্য দোয়া করে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যে পর্যন্ত মসজিদে নামাজের প্রতীক্ষায় থাকে, সে যেন নামাজের মধ্যেই থাকে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মসজিদে থাকে ফেরেশতারা সে পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে, ‘হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।’ অজু ছুটে না যাওয়া পর্যন্ত তার জন্য দোয়া চলতে থাকে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস ৩৩০)

১৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারীতা

নামাজ ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। যেকোনো ইবাদতের তুলনায় নামাজের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করলে ইহকাল পরকালে অনেক পুরস্কারের কথা এসেছে কোরআন-হাদিসে।

১. পবিত্র বান্দার খেতাব

আল্লাহ তাআলা পবিত্র বান্দাদের ভালোবাসেন। জান্নাতেও ঠিকানা হবে শুধুমাত্র পবিত্র বান্দাদের। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'ইসলাম পরিচ্ছন্ন। সুতরাং তোমরা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করো। নিশ্চয়ই জান্নাতে কেবল পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে।' (ফাইজুল কাদির: ৩০৬৫) অন্য হাদিসে মহানবী (স.) বলেছেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর দ্বীনের ভিত্তি স্থাপিত।' (মাউসুআতু আতরাফিল হাদিস আন-নাবাবি, পৃষ্ঠা-২৯৪)

নবীজি বলেছেন, নামাজিরা হলো পবিত্র বান্দা। তাদের কোনো গুনাহ থাকে না। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুল (স.)-কে বলতে শুনেছেন, 'বল তো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসুল (স.) বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।' (সহিহ বুখারি: ৫২৮)

২. অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে হেফাজত

নামাজিদের অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।' (সুরা আনকাবুত; আয়াত:৪৫) যারা নামাজ পড়ার পরও অশ্লীল কাজ করে, বুঝতে হবে তাদের নামাজ হচ্ছে না। হয়ত তাদের উপার্জন হারাম, নতুবা তাদের অজু-গোসল হচ্ছে না। এমনও হতে পারে, তার ইবাদত রিয়ামুক্ত নয় কিংবা তার রুকু-সেজদা সঠিক নয়।

৩. আল্লাহর ক্ষমা লাভ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময়ে আদায় করলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ক্ষমা করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি

উত্তমরূপে অজু করে নির্ধারিত সময়ে পূর্ণরূপে রুকু ও পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন, অন্যথায় শাস্তি দেবেন।' (সুনানে আবি দাউদ: ৪২৫)

৪. ফেরেশতাদের দোয়া লাভ

সময়মতো নামাজ আদায়ের জন্য যারা সময়ের আগেই মসজিদে উপস্থিত হয় এবং নামাজের জন্য অপেক্ষা করে ফেরেশতারা তাদের জন্য দোয়া করে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যে পর্যন্ত মসজিদে নামাজের প্রতীক্ষায় থাকে, সে যেন নামাজের মধ্যেই থাকে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মসজিদে থাকে ফেরেশতারা সে পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে, 'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।' অজু ছুটে না যাওয়া পর্যন্ত তার জন্য দোয়া চলতে থাকে। (তিরমিজি: ৩৩০)

৫. জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময়ে আদায় করলে তার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা নিজেদের নামাজের হেফাজত করে তারাই জান্নাতে সম্মানের পাত্র হবে।' (সুরা মাআরিজ; আয়াত: ৩৫)

মহানবী (স.) বলেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করবে, আর অবহেলার কারণে এর কোনোটি পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (যথাযথভাবে) আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

(সুনানে আবি দাউদ: ১৪২০)

৬. রিজিকে প্রশস্ততা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, ‘আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দেই এবং আল্লাহকে ভয় করার পরিণাম শুভ তথা কল্যাণকার।’

(সুরা ত্বাহা; আয়াত:১৩২) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘মহাপবিত্র আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব। তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর হতাশা দিয়ে পূর্ণ করব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব না।’ (ইবনে মাজাহ: ৪১০৭)

৭. সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা:

আল্লাহ বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾]الرعد :٢٨

"জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।" (সূরা আর-রা'দ; আয়াত: ২৮)

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى] (طه :١٤

"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।" (সূরা ত্বাহা; আয়াত: ১৪)

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ- শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।" (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।" (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ طه :١٢٤

"যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন- যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (সুরা ত্বাহা; আয়াত: ১২৪)

সাধারণত সালাতে অলসতাকারীরা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।

৮. সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ] (البقرة :٤٥[

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

(সূরা আল-বাকারা; আয়াত: ৪৫)

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।" (মুসনাদে আহমদ)

সাবেত রহ. বলেন, ‘‘নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।" (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ] (النمل :٦٢[

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" (সূরা আন-নামল; আয়াত: ৬২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে- আপদে চিনবে।" (মুসনাদ আহমদ)

৯. সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون :١، ٢

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" (সূরা আল-মুমিন; আয়াত: ১-২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، فَصَلَّى

ا:١٤،١٥ لاعلا لاعل

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" (সূরা আল-আ'লা; আয়াত: ১৪-১৫) আয়াতে উল্লিখিত "ফালাহ" শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

১০. সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে

অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তুবেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ] (المعارج :١٩، ٢٣]

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।"

(সূরা আল-মা'আরিজ; আয়াত: ১৯-২৩)

সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

১৪. নামাজ না পড়ার কঠিন শাস্তি

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, ‘নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।’ (সুরা নিসা; আয়াত ১০৩)

কঠিন শাস্তির বিধান নামাজ না পড়া পরকালে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘(জাহান্নামিদের জিজ্ঞাসা করা হবে) তোমাদের কোন জিনিস সাকারে (জাহান্নাম) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।’ (সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত ৪২-৪৩)

জাহান্নামে কঠিন শাস্তি বেনামাজিকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করা হবে।

নূহ, ইবরাহিম ও ইসরাঈল (আ.)-এর ব্যাপারে বর্ণনা করার পর পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, “তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই ‘গাইয়া’ প্রত্যক্ষ করবে।” (সুরা মারইয়াম, আয়াত ৫৯)

‘গাইয়া’ হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে আছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ। (তাফসিরে ইবনে কাসির) ‘গাইয়া’ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। (তাফসিরে কাশশাফ ও নাসাফি)

কঠোর হুঁশিয়ারি শুধু পরকালীন শাস্তি নয়, নামাজ না পড়লে ইহকালীন জীবনও বরকতশূন্য হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাজা হয় তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। (মুসলিম, হাদিস ১৩০৪)

কিয়ামতের দিন লাঞ্চনাকর শাস্তি কিয়ামতের দিন বেনামাজি সর্বপ্রথম যে অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার শিকার হবে, কোরআনের একটি আয়াতে তার বিবরণ এসেছে, যার মর্ম নিম্নরূপ'স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে। সেদিন তাদের আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল, তখন তো তাদের আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে। ' (সুরা কালাম, আয়াত ৪২-৪৩)

নামাজ দ্বিনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান যে নামাজ পড়ে না তার ঈমান খুবই দুর্বল। ইসলামে তার হিস্যা খুব সামান্যই। নামাজ না পড়াকে মহানবী (সা.) কুফরি কাজ ও কাফিরের স্বভাব বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এক হাদিসে এসেছে, যার ভেতর নামাজ নেই, তার ভেতর দ্বিনের কোনো হিস্যা নেই। (মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস ৮৫৩৯)

নামাজ মুমিন ও কাফিরের পার্থক্যকারী নামাজের মাধ্যমে ঈমান ও কুফরের পার্থক্য হয়। জাবির (রা.) বলেন, আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেওয়া। (মুসলিম, হাদিস ১৪৮)

নামাজ পরকালে মুক্তির অন্যতম উপায়। বুরাইদা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে (মুক্তির) যে প্রতিশ্রুতি আছে তা হলো নামাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দেয়, সে কুফরি কাজ করে। (তিরমিজি, হাদিস ২৬২১)

এই হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, যখন কেউ নামাজ ছেড়ে দেয়, তখন সে যেন কুফরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তার নামাজ না পড়াটা কুফরি কাজের সমতুল্য। নামাজ না পড়া কুফরিসদৃশ কাজ। তবে ওই ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে কি না, বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

পরকালে মুক্তির উপায় নামাজ পড়া কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়! আর নামাজ না পড়া কত বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়! হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যত্নের সঙ্গে আদায় করবে, কিয়ামতের দিন এ নামাজ

তার জন্য আলো হবে। তার ঈমান ও ইসলামের দলিল হবে এবং তার নাজাতের অসিলা হবে। আর যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত নামাজ আদায় করবে না, কিয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নামাজ তার জন্য আলো হবে না। দলিলও হবে না এবং সে আজাব থেকে রেহাইও পাবে না। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ৬৫৭৬)

১৫. শেষকথা

সালাত হলো বান্দার জন্য প্রেরিত আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ উপহার। প্রধানতম ফরজ, দ্বীনের অন্যতম মূল স্তম্ভ, নাজাত ও মুক্তির পূর্বশর্ত, ইমানের অতন্দ্র প্রহরী।আল্লাহ তায়ালা মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য। তাই সালাতের মাধ্যমে যেমন আল্লাহকে খুশি করা যায়, ঠিক তেমনি নিজেও মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে।ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয়টি হচ্ছে সালাত, পবিত্র কোরান ও হাদিস গ্রন্থে বহু জায়গায় সালাত কায়েম করার তাগিদ ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূল সা: এরশাদ করেছেন,

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেয়া হবে। যদি নামাজ ঠিক থাকে তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলে প্রমাণ হবে। আর যদি নামাজের হিসাবে গরমিল হয়, অন্যান্য আমলও ত্রুটি যুক্ত হয়ে যাবে।’ (তিরমিজি - ১:২৪৫ পৃ.)

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিদের প্রতিদান দেবেন। যারা দুনিয়াতে নামাজ কায়েম করেছে, জাকাত প্রদান করেছে, সেদিন তারা আনন্দ উল্লাস করতে থাকবে। তাদের জাহান্নামের কোনো ভয় থাকবে না। আর দুনিয়া বেনামাজিরা, সেদিন হা-হুতাশ করতে থাকবে।

কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَ اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ١ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ١ اِنَّ اللّٰهَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ

নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। নিজেদের পরকালের জন্য তোমরা যা কিছু সৎকাজ করে আগে পাঠিয়ে দেবে, তা সবই আল্লাহর ওখানে মজুত পাবে। তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। (সূরা বাকারা; আয়াত:১১০)

পরকালে সাফল্যে লাভের চাবিকাঠি হলো নামাজ আদায় করা। পরকালে নাজাত পেতে হলে, দুনিয়ার জিন্দেগিতে নামাজের প্রতি যত্নবান হতে হবে। নামাজি ব্যক্তিরাই জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হবেন।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

কুরআনে এরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই ওই সব ঈমানদার সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে খুশু-খুজুর সাথে আদায় করে।' (সূরা মুমিনুন; আয়াত:১-২)

নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে, আখিরাতে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। রাসূল সা: এরশাদ করেছেন, 'যার এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেল তার যেন ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন ও ধন-দৌলত সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হলো।

(ইবনে হিব্বান-৪:৩৩০ পৃ.)

সময়ের অল্প অল্প ব্যবধানে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করার পিছনে নিহিত রয়েছে আল্লাহ তায়ালার বিরাট হিকমত। সালাতের এই বারংবারতা ও প্রাত্যহিকতার মাধ্যমে মানুষ তার আত্মা ও রুহের জন্য লাভ করে পরিপূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্য। তদ্রূপ এতে রয়েছে কলবকে সৃষ্টিবিমুখ ও স্রষ্টামুখী করে পার্থিব লোভ লালসা ও শয়তানের চতুর্মুখী প্ররোচনা থেকে হিফাজতের পরিপূর্ণ ও কার্যকর ব্যবস্থা। (বোখারি: ৫০৩)

বস্তুতপক্ষে এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত- নির্ধারিত সময় ও রাকাআত সংখ্যাসহ- মানুষের রুহ ও আত্মার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষাকারী ইঞ্জেকশনস্বরূপ। আর স্বয়ং রাব্বুল আলামিন তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন এ ব্যবস্থাপত্র; যিনি মহাজ্ঞানী ও অনন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের যাবতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে যিনি মানুষের চেয়েও বেশি অবগত। তাই আমাদের উচিত অবনত মস্তকে তার নির্দেশ পালন করে যাওয়া।

ইমাম আহমদ রহ. তার "কিতাবুস সালাতে" বলেন, "তুমি জেনে রাখ! ইসলামে তোমার অংশ আর তোমার নিকট ইসলামের গুরুত্ব ততটুকু যতটুকু সালাতে তোমার অংশ এবং তোমার নিকট সালাতের গুরুত্ব এবং তুমি এমন অবস্থা থেকে বাঁচ যে, তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করছ, আর তোমার নিকট ইসলামের কোনো গুরুত্ব নেই, কেননা তোমার অন্তরে ইসলামের ততটুকুই গুরুত্ব হবে যতটুকু তোমার অন্তরে সালাতের গুরুত্ব থাকবে।"

*তথ্যসুত্র

১) সূরা আল বাকারা; আয়াত: ২৩৮-২৩৯

২) সূরা আল মু'মিনূন; আয়াত:১-২

৩) সূরা আ'লা; আয়াত:১৪-১৫

৪) সূরাআল-মাআরিজ; আয়াত: ১৯-২৩

৫) সূরা আত-তাওবাহ্; আয়াত: ১০৩

৬) সূরা তাহরীম, আয়াতঃ ৬

৭) সূরা তাহরীম, আয়াতঃ ৬

৮) জামে তিরমিযী; হাদিস নং:৩৮২

৯) সূরা আল মুনাফিকুন, আয়াত ৯

১০) সূরা বাকারা; আয়াত: ৪৩

১১) সূরা আল হাজ্ব; আয়াত:৭৮

১২) সূরা আল ইবরাহীম; আয়াত:৩১

১৩) সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত: ৭৮

১৪) সূরা হূদ; আয়াত ১১৪

১৫) সূরা আনকাবুত; আয়াত ৪৫

১৬) সূরা আহযাব; আয়াত ৩২-৩৩

১৭) সূরা আম্বিয়া; আয়াত ৭৩

১৮) সূরা মারইয়াম; আয়াত ৩০-৩৩

১৯) সূরা ত্বহা; আয়াত: ১২-১৪

২০) সূরা ইউনুস; আয়াত ৮৭

২১) সূরা মায়েদা; আয়াত ১২

২২) সূরা মায়েদা; আয়াত ৫৫

২৩) সূরা নামল; আয়াত ১-৩

২৪) সূরা আনফাল; আয়াত ২-৪

২৫) সূরা মুমিনুন; আয়াত ১-১১

২৬) সূরা মাআরিজ; আয়াত ২৩-৩৫

২৭) সূরা বাকারা; আয়াত ১-৫

২৮) সূরা লুকমান; আয়াত ১-৫

২৯) সূরা হজ্জ; আয়াত ৩৪-৩৫

৩০) সূরা আরাফ; আয়াত ১৭০

৩১) সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৭

৩২) সূরা তাওবা; আয়াত ৫

৩৩) সূরা তাওবা; আয়াত:১১

৩৪) সূরা নূর; আয়াত ৩৬-৩৭

৩৫) বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৯, ৩৩৪২, ৩৮৮৭; মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩ ও ২৬৪; ফাতহুল বারি: ৭/২৫০-২৫৯, মা'আরেফুল কোরআন ৭৬৪-৭৬৫

৩৬) বুখারীঃ হাদিস নং১০৪০, মুসলিমঃ হাদিস নং ৬৮৫

৩৭) মুখতাসারুস সিরাহ, শেখ আবদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৮৮

৩৮) ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭

৩৯) সূরা আল মু'মিন; আয়াত; ৫৫

৪০) সহীহ মুসলিম ২৩৩, আহমাদ ৯১৯৭, সহীহাহ্ ৩৩২২, সহীহ আল জামি' ৩৮৭৫, সহীহ আত তারগীব ৬৮৪

৪১) সহীহ বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৬৬৭, নাসায়ী ৪৬২, তিরমিযী ২৮৬৮, আহমাদ ৮৯২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭২৬, ইরওয়া ১৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫২

৪২) সূরা হূদ; আয়াত:১১৪

৪৩) সহীহ বুখারী ৫২৬, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১৪, ইবনু মাজাহ্ ৪২৫৪, আহমাদ ৩৬৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭২৯

৪৪) সহীহ বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ২৭৬৪

৪৫) সহীহ বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৮৫, নাসায়ী ৬১০, আহমাদ ৩৮৯০, ইরওয়া ১১৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৯৭

৪৬) সহীহ মুসলিম ৮২, আবূ দাঊদ ৪৬৭৮, নাসায়ী ৪৬৪, তিরমিযী ২৬২০, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৮

৪৭) সহীহ আহমাদ ২২৭০৪, আবূ দাঊদ ৪২৫, মালিক ১৪, নাসায়ী ৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৭০

৪৮) সহীহ আহমাদ ২১৬৫৭, তিরমিযী ৬১৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৬৭

৪৯) হাসান আবূ দাঊদ ৪৯৫, সহীহুল জামি' ৫৮৬৮, আহমাদ ২/১৮০ ও ১৮৭

৫০) সহীহ তিরমিযী ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৯ সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৪, আহমাদ ২২৯৩৭

৫১) হাসান আহমাদ ২১০৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩৮৪

৫২) হাসান সহীহ আহমাদ ২১১৮৩, আবূ দাঊদ ৯০৫, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮

৫৩) সহীহ তিরমিযী ২৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৫

৫৪) হাসান লিগয়রিহী ইবনু মাজাহ্ ৪০৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৭

৫৫) সূরাহ্ আন্ নিসা; আয়াত: ১০৩

৫৬) সহীহ মুসলিম ৬১২, আহমাদ ৬৯৬৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪৭৩

৫৭) সহীহ মুসলিম ৬১৩, ইবনু মাজাহ্ ৬৬৭, তিরমিযী ১৫২, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্ ৩২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪৯২, আহমাদ ২২৯৫৫

৫৮) সহীহ আবূ দাঊদ ৩৯৩, তিরমিযী ১৪৯, সহীহুল জামি’ ১৪০২

৫৯) সুরা রূম; আয়াত: ১৭,১৮

৬০) যয়ীফ, আবু দাউদ ১০৮১নং

৬১) সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত:৭৮

৬২) সূরাআল-আ’রাফ; আয়াত:২০৬৩

৬৩) সূরা ক্বাফ; আয়াত:৩৯

৬৪) বুখারী ৫৫৪, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৫৩৬; মুসলিম ৬৩৩, তিরমীযি,২৫৫১, আবূ দাঊদ ৩৭২৯, আহমাদ ১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭২৬। তাহকিক আলবানী: সহীহ

৬৫) সহীহ মুসলিম, ৬৩৪

৬৬) বুখারী ৬৫৭,৬৪৪,২৪২০,৭২২৪; মুসলিম ৬৬১

৬৭) বুখারী, হাদিস১১৪২

৬৮) সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিজি ৪১৬

৬৯)মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৯

৭০) সহিহ মুসলিম, তিরমিজি ২১৮৪

৭১) মুসলিম, হাদিস ১৩৭৭

৭২) সহিহ মুসলিম, হাদিস:১০৯৬

৭৩) আবু দাউদ, হাদিস৪৯৪

৭৪) তিরমিজী:১/৫৫৩

৭৫) সহীহ বুখারী:১১৮২

৭৬) মিশকাত-৬১৩, সহীহ্ আবূ দাঊদ-৪৪৫

৭৭) (বুখারী ৫৫৪, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৫৩৬; মুসলিম ৬৩৩, তিরমীযি,২৫৫১, আবূ দাঊদ ৩৭২৯, আহমাদ ১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭২৬। তাহকিক আলবানী: সহীহ

৭৮) মুসলিম, হাদিস: ১৩২২

৭৯) মুসলিম, হাদিস: ১৩২২

৮০) সূরা হুদ; আয়াত:১১৪

৮১) বুখারি, হাদিস: ৫৬১

৮২) বুখারি, হাদিস: ৬২২

৮৩) তিরমিজি, হাদিস: ৬৩৬

৮৪) সূরা হুদ; আয়াত:১১৪

৮৫) সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৭

৮৬) সহীহ মুসলিম হাদিসঃ ৬৫৬

৮৭) সুরা জুমআ; আয়াত৯-১০

৮৮) সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪১৪; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৮১৪

৮৯) শারহু মুশকিলিল আছার, হাদীস ৩৮২৮; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৭৩২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৭২৯; সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদীস ১৬৭৭: মুজামে কাবীর, তবারানী ৬/২৩৭ (৬০৮৯) হাকেম, হাদীস ১০২৮

৯০) সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৭৬৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৭৭৮; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৭৬২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০৪৬৫

৯১) সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৮৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৫৫৬৩

৯২) সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৪০৩

৯৩) সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৫০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪৮৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১২৩১

৯৪) মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৯২১; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৪২৭৮

৯৫) সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৫

৯৬) সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮২০

৯৭) সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৬

৯৮) সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯

৯৯) জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৫৪৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১৫৬

১০০) সূরা যারিয়াত; আয়াত ১৫

১০১) সূরা যারিয়াত; আয়াত: ১৮

১০২) সূরা ফুরকান; আয়াত ৬৪

১০৩) সূরা ফুরকান; আয়াত ৭৫-৭৬

১০৪) জামে তিরমিযি, হাদীস ২৪৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩২৫১

১০৫) মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৯; জামে তিরমিযি, হাদীস ২৫২৭

১০৬) সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-৫৮৬

১০৭) শুয়াবুল ঈমান লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৩৬৭১

১০৮) সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, সংখ্যা নং-৪১০৬, মাউয়্যা যোগেদ, সদস্য নং-৩৪১৮, ১৯, মুসনদুল ফডর, সদস্য নং-৩৮৯০

১০৯) মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুয়া, হাদীস নং-১১, সুনানে দারামী, হাদীস নং-১৪৯৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-১৫৩৬

১১০) সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৩৮০, সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-৪৭৩

১১১) সহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদীস নং-১১৯৪

১১২) সহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদীস নং-১১৯৫

১১৩) সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-৪৩৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৩৭৪

১১৪) মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৫৯২২

১১৫) আল-সাজদাহ; আয়াত:১৬

১১৬) শুয়াবুল ঈমান লিলবায়হাকী, হাদীস নং-২৮৪০, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৪৮১৩

১১৭) শরহুস সুন্নাহ লিলবাগাবী, হাদীস নং-৮৯৭

১১৮) সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৩৪

১১৯) সহীহ মুসলিম; হাদিস: ১৫৪১

১২০) সহীহ মুসলিম; হাদিস: ১৫৫৩

১২১) সহীহ বুখারী; হাদিস: ৬৪৫

১২২)সহীহ মুসলিম; হাদীস-১৫২৩

১২৩)সুনানে আবু দাউদ; হাদিস: ৫৫৮

১২৪)সুনানে তিরমিজি; হাদিস২৪১

১২৫)সহীহ বুখারী; হাদিস:৬৪৪

১২৬)সুনানে আবু দাউদ; হাদিস; ৫৫১

১২৭)মুসনাদু আহমাদ: ৩/১২৮

১২৮)সূরা আল-আহজাব; আয়াত:৩৫

১২৯)সূরা আল- বাকারা: ৪৫

১৩০)তাফসিরে ইবনে কাসির (১/১২৫)

১৩১) সুরা ইবরাহিম; আয়াত০৭

১৩২) সুনানে আবু দাউদ: ২৪২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৪৮৮

১৩৩) সুনানে আবু দাউদ ৪৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ: ২৩১৩৭, আল মুজামুল কবির: ৬২১৫

১৩৪) সুরা মুদ্দাসসির আয়াত ৩৮-৪৭

১৩৫) সুরা নিসা; আয়াত, ১০৩

১৩৬) সুনানে আবি দাউদ, হাদিস ১৪২০

১৩৭) সুনানে আবি দাউদ, হাদিস ৪২৫

১৩৮) সুনানে আবি দাউদ, হাদিস ৪২৬

১৩৯) সুনানে তিরমিজি, হাদিস ৩৩০

১৪০) মাউসুআতু আতরাফিল হাদিস আন-নাবাবি, পৃষ্ঠা-২৯৪

১৪১) সহিহ বুখারি: ৫২৮

১৪২) সুনানে আবি দাউদ: ৪২৫

১৪৩) তিরমিজি: ৩৩০

১৪৪) সুরা মাআরিজ; আয়াত: ৩৫

১৪৫) সুনানে আবি দাউদ: ১৪২০

১৪৬) সুরা ত্বাহা; আয়াত:১৩২

১৪৭) ইবনে মাজাহ: ৪১০৭

১৪৮) সূরা আর-রা'দ; আয়াত: ২৮

১৪৯) সূরা ত্বাহা; আয়াত: ১৪

১৫০) সুরা ত্বাহা; আয়াত: ১২৪

১৫১) সূরা আন-নামল; আয়াত: ৬২

১৫২) সূরা আল-আ'লা; আয়াত: ১৪-১৫

১৫৩) সূরা আল-মা'আরিজ; আয়াত: ১৯-২৩

১৫৪) সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত ৪২-৪৩

১৫৫) সুরা মারইয়াম, আয়াত ৫৯

১৫৬) তাফসিরে কাশশাফ ও নাসাফি

১৫৭) মুসলিম, হাদিস ১৩০৪

১৫৮) সুরা কালাম, আয়াত ৪২-৪৩

১৫৯) মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস ৮৫৩৯

১৬০) মুসলিম, হাদিস ১৪৮

১৬১) তিরমিজি, হাদিস ২৬২১

১৬২) মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ৬৫৭৬

১৬৩) তিরমিজি-১:২৪৫পৃ

১৬৪) ইবনে হিব্বান-৪:৩৩০ পৃ.

১৬৫) বোখারি:৫০৩

১৬৬) https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/

১৬৭) https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=104

১৬৮) https://www.linkedin.com/pulse/

১৬৯) সহায়ক গ্রন্থ: সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম আল-ফালেহ অনবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান।

১৭০) সহায়ক গ্রন্থ: ফিকহুস সালাত, সংকলন; আরিফুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ।

১৭১) সহায়ক গ্রন্থ আমার সালাত; মুফতি মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, প্রথম প্রকাশ

১৭২) সহায়ক গ্রন্থ- উসওয়াতুল লিল আলামিন-ডঃ রাগিব সারজানি; অনুবাদ-শামীম আহমাদ। মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনা

সমাপ্ত

গবেষণার বিষয় ব্যাপক হওয়ায়, এবং সময় স্বল্পতার ও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারনে "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" গবেষণামূলক প্রবন্ধে অনেক হাদিস এবং আরও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংযোগ করা সম্ভব হয়নি। লেখকের ভুলত্রুটি মার্জনীয়।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110765859/